বুধবার ■ ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ■ ৩০ পৌষ ১৪৩১ ■ ১৩ রজব ১৪৪৬ হিজরি ■ পাক্ষিক পত্রিকা ■ দাম: ৫ টাকা

বইপড়া: ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর রূপজালাল

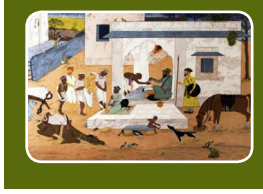

ইতিহাস: জিজিয়া কর: প্রকৃত বাস্তব ও বহমান বাস্তবের সমীকরণ

পাক্ষিক সংবাদ-সাময়িকী
দৃষ্টি
ভিতরে বাইরে

শিক্ষা: সরকার পোষিত মাদ্রাসা: পর্যালোচনা

সমাজ: উমর খালিদ ও আমাদের দায়বদ্ধতা

Vol: 2 ■ Issue: 2 ■ DRISHTI ■ 15 January 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ Fortnightly News Paper ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ Editor: Saifulla

বইমেলা: থাকছে না বাংলাদেশ; ওপারের বইও

রবিউল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা

আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২৫। এমনিতে এর মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই। প্রতি বছরই শীতের আমেজ সর্বাঙ্গে ধারণ করে কলকাতা বইমেলা বেশ জমে ওঠে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তবে ভিতরে ভিতরে ব্যতিক্রমের চোরা স্রোত কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। এবারের সবচেয়ে বড়ো বৈপরীত্য, বাংলাদেশ ব্যাভিলিয়ন না থাক, কলকাতায় বইমেলা হচ্ছে আর পদ্মার ওপারের বাঙালি সমাজ তাদের রচিত এবং প্রকাশিত বই সহকারে পসার সাজিয়ে বসছে না: সাম্প্রতিককালে এমনটা প্রায় হয়নি যা হয় না, এবার কিন্তু তাই হচ্ছে। আলাদা করে চোখে পড়ার মতো করে বাংলাদেশ ব্যাভিলিয়ন তো হচ্ছেই না, থাকছে না বাংলাদেশি প্রকাশকদের স্বতন্ত্র কোনো স্টলও। বইমেলায় যারা বই কিনতে আসেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশের বিশেষ নজর থাকে বাংলাদেশের বই এর দিকে। এবার তারা সম্পূর্ণ হতাশ হবেন। কাঙ্ক্ষিত বই এর প্রাপ্তি যোগ তো দূরের কথা, স্বজাতি ও স্বসম্প্রদায় প্রণীত অনন্য গুণপনায় ঋদ্ধ বিচিত্র বিষয়ক দৃষ্টিনন্দন সব বইকে দর্শন ও স্পর্শ করে অন্যরকম তৃপ্তি অনুভব করার যে পরিতৃপ্তি তাও বিনষ্ট হতে চলেছে। সে গুড়ে বালি দেওয়ার বন্দোবস্ত এখন প্রায় চূড়ান্ত।

এক্ষেত্রে ঘটনার সূত্রপাত মার্চ—এপ্রিল ২০২৪ নাগাদ শুরু হওয়া পদ্মাপারের ছাত্র আন্দোলন সূত্রে। যে ছাত্র আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পদচ্যুত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কেবল পদচ্যুত হতে হয় নি, আপৎকালীনভাবে দেশত্যাগও করতে হয়েছে তাঁকে। তিনি এখন ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন। অতঃপর ঘটনা পরম্পরায় দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের বিশেষ অবনতি হয়েছে। আর এই অবনতির সাপেক্ষে এবারের কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশি প্রকাশকদের অংশগ্রহণ প্রশ্নে দিল্লির দরবার থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র প্রদান করা হয়নি। এতে করে, কলকাতা বইমেলা কর্তৃপক্ষ এবারের মতো বাংলাদেশি প্রকাশকদের না করে দিয়েছেন।

বইমেলায় বাংলাদেশি প্রকাশকরা এভাবে ব্রাত্য হয়ে ওঠায় আমাদের বইমেলা কর্তৃপক্ষ কতটা বিচলিত ও পীড়িত হয়েছেন, তা তারাই জানেন। হতে পারে তারা অত্যন্ত ব্যথিত বা তার থেকেও আরও অনেক কিছু। কিন্তু সমস্যা হল, তাদের সে বিচলিতভাবের কোনো বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যাচ্ছেনা সেভাবে। তারা তাদের দিক থেকে এমন অপ্রিয় অবস্থার নিরসনে বিশেষ সক্রিয় অবস্থান নিয়েছেন বলে আমাদের অন্তত জানা নেই। আমরা যতদূর জানি, এক্ষেত্রে দিল্লির সিদ্ধান্তকে কোনো প্রশ্নচিহ্ন নিরপেক্ষভাবে মাথায় তুলে নিয়েছেন তারা।

স্বীকার করতেই হবে, তাদের এই অবস্থান অস্বস্তিকর হলেও অস্বাভাবিক নয়। কেননা উত্তর হাসিনা পর্বে সীমান্তের দুপারে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, দুটি রাষ্ট্রের সম্পর্কের উপর যা সাংঘাতিক প্রভাব ফেলেছে। এমন অবস্থায় বইমেলা কর্তৃপক্ষের পক্ষে বিশেষ লম্ফঝম্ফ না করাই শ্রেয়। সময়ের স্রোতে হয়তো ভেসে যাবে অনেক কিছুই। তখন আবার হয়তো সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কাজেই অতিরিক্ত তৎপরতা, না দেখিয়ে অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

ঘটনা স্রোত যদি এই পর্যন্ত প্রবাহিত হতো তাতে তেমন উদ্বিগ্ন না হলেও চলতো। কিন্তু সমস্যা হল, বিষয়টা এখানেই থেমে নেই। সমস্যার মূল প্রোথিত হয়েছে আরও গভীরে। লোকমুখে প্রকাশ, এপারের বইমেলায় বাংলাদেশের বই এর বিপণন যাতে না হয় তার জন্য বইমেলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আলাদা করে সক্রিয়তা দেখানো হচ্ছে।

কলকাতা কেন্দ্রিক বেশ কিছু প্রকাশক ও বইবিক্রেতা রয়েছেন, যারা মুখ্যত বাংলাদেশের বই সহযোগে তাঁদের স্টলকে সজ্জিত করেন। অতিরিক্ত ভিড় বা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশ ব্যাভিলিয়ন থেকে বই ক্রয় করতে যাদের সমস্যা হয় তারা বাংলাদেশের বই কেনার জন্য এইসব স্টলগুলোতে ভিড় করেন। বইমেলার সময় তাই এইসব স্টলে বিক্রিবাটা ভালোই হয়। কিন্তু বইমেলা কর্তৃপক্ষ চাইছেন না এবার ওইসব স্টল মালিকরা তাদের স্টলে বাংলাদেশের বই রাখুন ও বিক্রি করুন। গত কয়েক দিন আগে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ডেকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিবেদন আকারে নির্দেশিত হয়েছে বিষয়টি।

বলা হয়েছে, তারা যদি তাদের স্টলে বাংলাদেশের বই রাখেন সেক্ষেত্রে কেউ কেউ সেখানে ঢুকে ঝক্কি ঝামেলা করতে পারে। অন্তত তার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তেমন হলে বইমেলা কর্তৃপক্ষ কোনো দায়িত্ব নেবেন না। নিতে পারবেন না। কাজেই ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। তারা আরও নিবেদন করেছেন, তেমন হলে, কলকাতা বইমেলার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এবং তার দায় বর্তাবে সংশ্লিষ্ট স্টল মালিকদের উপর।

সেক্ষেত্রে এইসব স্টলকে ব্ল্যাক লিস্টেট করে দেওয়া হবে; ভবিষ্যতে তারা আর বইমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ না পেতে পারেন।

হতে পারে, বইমেলা কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত নিছকই কৌশলগত। তারা মন থেকে এটা চাইছেন না। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন। যদি তাই হয়, তবে অবশ্যই বিশেষ কিছু বলার নেই; অন্তত না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আবার এও ঠিক যে, এই না থাকাটা কখনো অসীমান্তিক হতে পারে না। হওয়া উচিত নয়। বইমেলা কর্তৃপক্ষ তাদের অতিরিক্ত দায়বদ্ধতার সাপেক্ষে অনেক কথা বলতে বা করতে পারেন না। কিন্তু আমাদের তো সেই দায়বদ্ধতা নেই। আমরা তাই আমাদের মতো উচ্চকণ্ঠ হতেই পারি।

প্রতি বছর যেমন হয় এবারও তাই হচ্ছে। কলকাতা বইমেলা শুরু হওয়ার আগে একে একে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেলা বইমেলা সমূহ। এক্ষেত্রে ঘটনার সূত্রপাত বহরমপুরে অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ বইমেলা সূত্রে। বিশেষ মতপথের অনুসারী কিছু মানুষ বহরমপুর বইমেলায় ঢুকে কোনো কোনো স্টলের উপর চড়াও হয় এই কারণে যে, সেখানে বাংলাদেশের বই ডিসপ্লে করা রয়েছে এবং বিক্রি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বই বিক্রি বা প্রদর্শন করাতে জেলা বইমেলা কর্তৃপক্ষের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, নেই কোনো সতর্কবার্তাও। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের বই বিক্রি করা কিছুমাত্র দোষের হতে পারে না। তবু তারপরেও চড়াও হওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ ইতিবাচকতা এই যে, এই চড়াও হওয়াকে বরদাস্ত করা হয়নি একেবারেই। সম্ভাব্য সব স্তর থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে; আলাদা করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও। তিনি তাঁর প্রশাসনকে এ ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। যাইহোক, সবমিলিয়ে হামলাকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে শেষাবধি। বহরমপুর বইমেলার পর আরও যেসব জেলা বইমেলা হয়েছে বা হচ্ছে তার কোথাও আর তাদের দেখা পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় কলকাতা বইমেলা কর্তৃপক্ষ যদি আর একটু দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন তবে যথার্থ হত। এভাবে অপশক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এতে তাদের ডানা আরও শক্ত ও প্রশস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। আমাদের তাই কিছু করণীয় রয়েছে। আমরা নির্বিকার থেকে কিছুতেই ঘটনা-স্রোতকে এর নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হতে দিতে পারিনা।

আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে জায়মান এই অবস্থার বিপরীতে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার; গর্জে ওঠার; সম্ভাব্য সমস্ত শক্তিকে সংহত করে ঝাঁপিয়ে পড়ার। মনে রাখতে হবে, এভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালি সমাজ বরাবরই অতিরিক্ত দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কোনো রকমের কোনো অন্যায় সংঘটিত হলে তাকে উপলক্ষ্য করে কলকাতার রাজপথকে আলোড়িত করা আমাদের বহুদিনের অভ্যাস। আজ আমরা আমাদের এমন জাতীয় অবস্থান থেকে সরে আসবো কেন! তেমন হলে তো সম্মান বজায় থাকে না। প্রতিপক্ষ থেকে বর্ষিত চোখাচোখা সব প্রশ্নবাণে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হতে হয়। এখন লড়াইটা ঘরের মানুষের সঙ্গে, অন্য অর্থে নিজের সঙ্গে। তাই কি এভাবে পশ্চাদপসরণ। তাই যদি হয় তাহলে মুখ দেখান যাবে কীভাবে। প্রতিবাদটা যখন নিছকই প্রতিবাদ, তখন রাস্তায় নেমে বীরত্ব প্রকাশ করা হবে। আর যখন প্রকৃত হাতে কলমে প্রতিবাদের আবশ্যকতা দেখা দেবে তখন লেজ গুটিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে, এই অশিষ্টতা! এ তো বড়োই অশোভন। হতে পারে, রাষ্ট্রনৈতিক নানা বিষয়ে ওদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এদেশের কর্তাব্যক্তিদের মতবিরোধ হচ্ছে। কিন্তু তার প্রভাব কেন বইমেলার উপর পড়বে! আমরা কেন সোচ্চার কণ্ঠে বলতে পাবরো না, আমরা এই সিদ্ধান্ত মানি না: এর প্রতিবাদ করছি।

বইমেলায় বাংলাদেশকে ছাড়পত্র না দেওয়ার বৃত্তান্ত প্রকাশ্যে এসেছে বেশ কিছু দিন হল। এতদিনেও বুদ্ধিজীবী সমাজের পক্ষ থেকে তেমন কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি। অন্তত আমাদের কাছে তার কোনো সংবাদ নেই। ঘটমান অবস্থার সাপেক্ষে চূড়ান্ত সুবিধাবাদী একটা অবস্থানে স্থিত রয়েছি বা থাকার চেষ্টা করছি আমরা। সরকারি ব্যাপার স্যাপার বলে নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে। এদিকে এই আমরাই আবার প্রতিবাদে ফেটে পড়ছি ওপারে জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন নিয়ে কানাঘুষো কথা শুরু হওয়ার কারণে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপার স্যাপারের ধুয়োতুলে যদি বইমেলায় বাংলাদেশিদের না আসতে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া হয় বা স্বাগত জানানো হয় তবে সেই তারা তাদের জাতীয় সংগীত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তাতে নাকগলানো কেন! অবশ্যই জাতীয় সংগীত নিয়ে ওপারের একশ্রেণির মানুষ যে চিন্তাচেতনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তবে এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার নিরসন করতে হবে স্বাস্থ্যকর পথে। এখানে কোনো দ্বিচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে চরম বিচলিত হয়ে পড়বো; আর বইমেলায় বাংলাদেশকে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার সূত্রে পরম নির্বিকারত্ব প্রাপ্ত হব, এটা হতে পারে না।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, জাতীয় সংগীত নিয়ে একশ্রেণির মানুষের অপ্রিয় ভাবনা রুখে দেওয়ার জন্য ওপারের মানুষই যথেষ্ট। এমন নানা বিষয়ে অতীতে একাধিকবার তারা তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তদানীন্তন পাক প্রভুরা অনেক চেষ্টা করেও তাদেরকে বাগে আনতে পারেননি; এখন যারা এমনটা করার চেষ্টা করছেন তারাও পারবেন না। বরং এক্ষেত্রে আমাদের এই যে দ্বিচারিতা, তার সূত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে। বিরুদ্ধবাদীরা এটাকেই হাতিয়ার করে তুলতে পারেন। কলকাতা বইমেলায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে না ওপারের প্রকাশকদের। এমনকি তাদের প্রকাশিত বইপত্র বিক্রি করার উপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা; এমন বৃত্তান্তকে সামনে আনা হলে তাদের পক্ষে দৃঢ় হতে পারে জনমত।

আমাদের কথা

বর্ষ-২ ■ সংখ্যা-২ ■ ৩০ পৌষ ১৪৩১ ■ ১৩ রজব ১৪৪৬ হিজরি

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উপাচার্য নিয়োগ: এটা কী হচ্ছে

অনেক দিন ধরে অনেক টালবাহানা চলছিল। শেষাবধি জল গড়ালো সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। অতঃপর সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ সাপেক্ষে বেশ একটা কাম্য অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও তো কাঙ্ক্ষিত ফললাভ হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত কমিটি উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত দিক সম্পন্ন করেছেন অনেক দিন হয়ে গেল। যতদূর জানা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দিক থেকে যা কিছু করণীয় ছিল তাও সম্পন্ন করা হয়েছে। এখন বিষয়টা যে অবস্থাতে রয়েছে তাতে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মনোনীত উপাচার্যের নাম ঘোষিত হওয়ার জন্য ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা যথেষ্ট। এদিকে সামান্য এই সময়তো দূরের কথা, মাসাধিক কাল অতিবাহিত হয়েছে এবং তারপরেও। উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি।

এই মুহূর্তে এ রাজ্যে সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬টি। এর মধ্যে একটিতে উপাচার্য প্যানেল চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি বিশেষ কারণে। তাহলে বাকি থাকে ৩৫টি। এই ৩৫টির মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপাচার্যদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্যপালের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ বাকি রয়েছে আরও ১৮টি। সংখ্যাটা তুলনায় অনেক বেশি। একদিক থেকে দেখলে অত্যন্ত দৃষ্টিকটুও বটে। আমরা, আগেই বলেছি, আমাদের বোধবুদ্ধি অনুসারে এই বিলম্বের কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তবু বিলম্ব হচ্ছে। খুবসম্ভব ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিলম্ব করা হচ্ছে। কিন্তু কেন? রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ডামাডোল চলছিল প্রথমাবধি।

অর্থাৎ বাম জমানার অবসানে নতুন সরকার দায়িত্বে আসীন হওয়ার পর থেকে। উপাচার্য পদে কাউকে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম যোগ্যতা আবশ্যক তার তোয়াক্কা না করে এবং পদ্ধতিগত দিককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেমন খুশি তেমন করে উপাচার্য নিয়োগ চলছিল রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে।

সঙ্গতভাবে কেউ কেউ এর বিরোধিতা করে আইনি সহায়তা নিয়েছিলেন এবং বিচার বিভাগের নির্দেশক্রমে অবৈধ ভাবে নিযুক্ত সমস্ত উপাচার্য একযোগে বরখাস্ত হয়েছিলেন। অতঃপর মাঠে নেমেছিলেন রাজ্যপাল মহাশয় এবং তিনিও কোনো দিক থেকে কোনো অংশে কম যাননি। আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি পদ্ধতি অনুসারে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উপাচার্য নিয়োগের প্রশ্নে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। কার্যকর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো এক্তিয়ার তাঁর নেই। তিনি রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশকে কার্যকর করবেন মাত্র। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তার ঠিক উল্টো চিত্র। রাজ্যপালই হয়ে উঠতে চাইলেন সর্বেসর্বা। যেন তাঁর সিদ্ধান্তই শেষকথা। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে নিযুক্ত করতে শুরু করলেন এবং মর্জি মতো যখন তখন তাঁকে বরখাস্ত করতেও কোনোরকম পিছপা হলেন না। সবমিলিয়ে বিষয়টাকে যেন ছেলেখেলার পর্যায়ে নামিয়ে আনা হল। এই ছেলেখেলার শেষ হয়নি এখনও। সুপ্রিমকোর্টের দিক থেকে একের পর এক নির্দেশ জারি করা হচ্ছে– এত দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, কিন্তু তারপরেও কাজের কাজ হচ্ছে না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা চরমে পৌঁছে গেছে অনেক আগেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে আবশ্যক পরিকাঠামো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিংটা কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাত্র; বিদ্যাচর্চার একেবারে দফারফা অবস্থা। এখন কথা হল; এই অবস্থার দায় কার কতটা। কোনো সন্দেহ নেই, প্রথম দিককার সিংহভাগ দায় বর্তাবে রাজ্য সরকারের উপরেই। তারাই যাকে খুশি তাঁকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক একজন সহকারী অধ্যাপককে যেন তেন ভাবে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করে পরিস্থিতির অবনমন ঘটিয়েছিলেন। অবশ্য এখন কিন্তু বল সম্পূর্ণত রাজ্যপালের কোর্টে। অর্থাৎ ঘটমান পরিস্থিতির দায়ভার তাঁর উপরেই বর্তাচ্ছে। রাজ্য সরকার তাদের দিক থেকে দায় মুক্ত হয়েছেন অনেকাংশে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে উচ্চশিক্ষা দপ্তর অত্যন্ত দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত দিক নিষ্পন্ন করেছে। সঙ্গতভাবে জিজ্ঞাসা দানা বাঁধছে, রাজ্যপাল কেন বিলম্ব করছেন। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন সেখানে এই বিলম্বের কোনো সঙ্গত কারণ না থাকারই কথা। তাহলে কী অনৈতিকভাবে রাজ্যপাল মহাশয় বিলম্ব করছেন। সম্ভবত তাই-ই। কিন্তু স্বরূপত সবটা তা নয় বলেই মনে হচ্ছে। যতদূর জানা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার তাদের পছন্দের কাউকে কাউকে উক্ত ব্যক্তির পছন্দসই স্থানে নিযুক্ত করার অস্বাভাবিক দায় অনুভব করছেন। এই দায়ভার বহন করার সূত্রে অনেক ন্যায় অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করতেও তারা কোনো দ্বিধা করছেন না। তাদের এমন ইচ্ছা বা দায়বদ্ধতা স্বীকারের সিঁড়ি পথে তরতরিয়ে উপরের দিকে উঠছেন রাজ্যপাল মহাশয়। যেখানে তাঁর কোনো পছন্দই কার্যকর হওয়ার নয় সেখানে ইতোমধ্যেই অর্থাৎ যে সতেরো জনের নাম ঘোষিত হয়েছে তাদের মধ্যে তাঁর পছন্দের কাউকে কাউকে জায়গা করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। বলা যায়, এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে দিয়ে তিনি হেঁটমুন্ডর জল খাওয়াচ্ছেন।

হতে পারে, রাজ্যপালের ইচ্ছার সমীপে রাজ্যে সরকারের এভাবে হেঁটমুণ্ড হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে আরও কোনো বৃত্তান্ত। কেউ কেউ ধারণা করছেন, এসব কিছুই আসলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বাংলার বাইরের আর কোনো অতীব ক্ষমতাশীল নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের দ্বারা। এই নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ শক্তি এতটাই যে, আমাদের পরম বেপরোয়া মুখ্যমন্ত্রীও তাকে অস্বীকার করতে পারছেন না। নিন্দুকরা অবশ্য দু পা অগ্রসর হয়ে আরও নানা কথা বলছেন। তাদের ধারণা, এমনিতে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়া যতই তাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন অবস্থান নিন না কেন, আসলে এসবই লোক দেখানো; ভিতরে ভিতরে তিনি বরাবরই তাঁদের সঙ্গে গভীর সখ্যতা বা সমঝোতা বজায় রেখে চলেছেন। তাঁদের এই সমঝোতার কারণেই উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি জটিলতর রূপ নিচ্ছে।

কীসের কারণে বা কী থেকে কী হচ্ছে আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না। আমরা মোটের উপর আদার ব্যাপারী; জাহাজের খবর আমাদের কাছে সেভাবে পৌঁছায় না। তাছাড়া এসব জাহাজী-খবর নিয়ে আমাদের আগ্রহও তেমন নেই। আমাদের মাথাব্যথা হচ্ছে অন্য কারণে। এমনিতেই এ রাজ্যের উচ্চশিক্ষার অবস্থা একেবারেই সুবিধাজনক নয়। একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাঙালিরাই শেষকথা বলতেন এখন পিছাতে পিছাতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে অরাজকতা শুরু হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

কথায় বলে, নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। কিন্তু হায়। আমরা যে পাগলেরও অধম। আমরা আমাদের ভালোটাও বুঝছি না। আর যাই হোক, শিক্ষা ক্ষেত্রটাকে নিষ্কলুশ রাখা বা অপবিত্র হতে না দেওয়ার চেষ্টা করেন ন্যূনতম বোধবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মানুষ থেকে শুরু করে জাতি, সম্প্রদায় সকলেই। কিন্তু আমরা এতটাই নির্বোধ বা অপদার্থ, যে এই সামান্য বিষয়টাও হ্যান্ডেল করতে পারছিনা। স্কুল শিক্ষা ক্ষেত্রে যে লেজে গোবরে অবস্থা হয়েছে তার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো একসময় যারা শিক্ষা বিভাগের হর্তাকর্তা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই এখন শ্রীঘরের ঘানি টানছেন। এর থেকে লজ্জার বা অপমানের আর কী হতে পারে। এখন যা অবস্থা তাতে স্কুল শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সোনার ফসল ফলা দূর অস্ত। আইনি জটিলতা যা আছে তাতো আছেই। আইনের ফাঁক দিয়ে যে বিপুল সংখ্যক অযোগ্য শিক্ষক গলে গেছে বা যাবেন তারা আগামী ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে শিক্ষকতায় পেশায় বহাল থাকবেন এবং তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিরপরাধ ছাত্রসমাজকে। এরই মধ্যে উচ্চশিক্ষাতেও এই দুরবস্থা। এর নিরসন না হলে আগামীতে আরও দুর্গতি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। তেমন হলে সরকারি ব্যবস্থাপনার উপর মানুষের আর কোনোই আস্থা থাকবে না। কালক্রমে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে সরকারি পরিকাঠামো। এদিকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করার সুযোগ থাকবে না অধিকাংশ জনের।

হতে পারে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এই যে ডামাডোল চলছে এবং এ প্রসঙ্গে যত কথা আমরা বলছি তা আসলে সত্যের ভগ্নাংশ বা তার থেকেও কম কিছুকে ধারণ করছে মাত্র। আমরা বিরাট হিমশৈলের ভাসমান অংশকে দর্শন করছি। দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে আরও ভয়ঙ্কর সব সত্য। এর সবটাই আসলে হয়তো লড়াই লড়াই খেলা। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়া আর সবকিছুকে পদদলিত করতে পিছপা, হচ্ছেন না।

কী হচ্ছে আর কী কী হচ্ছে না আমরা তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না। আর পারলেও তার জন্য অনেক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হতে পারে। কাজেই আরও অধিক কথনে উৎসাহী হচ্ছি না। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি, যে এভাবে চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। উত্তর সাতচল্লিশ পর্বে আমাদের যতটা অগ্রগতি হয়েছে, অগ্রসরতা এসেছে তার নেপথ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের। অন্য অনেক বিষয়ে অগ্রগামীতায় আমরা বরাবরই অবশিষ্ট ভারতকে পথ দেখিয়েছি: আদায় করে নিয়েছি বহির্ভারতীয়দের গভীর সমীহ। কিন্তু যা চলছে তা চলতে থাকলে পরিস্থিতির সাংঘাতিক রকমের অবনমন হতে বাধ্য।

এই মুহূর্তে এ রাজ্যে সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬টি। এর মধ্যে একটিতে উপাচার্য প্যানেল চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি বিশেষ কারণে। তাহলে বাকি থাকে ৩৫টি। এই ৩৫টির মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপাচার্যদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্যপালের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ বাকি রয়েছে আরও ১৮টি। সংখ্যাটা তুলনায় অনেক বেশি। একদিক থেকে দেখলে অত্যন্ত দৃষ্টিকটুও বটে। আমরা, আগেই বলেছি, আমাদের বোধবুদ্ধি অনুসারে এই বিলম্বের কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তবু বিলম্ব হচ্ছে। খুবসম্ভব ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিলম্ব করা হচ্ছে। কিন্তু কেন? রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ডামাডোল চলছিল প্রথমাবধি। অর্থাৎ বাম জমানার অবসানে নতুন সরকার দায়িত্বে আসীন হওয়ার পর থেকে। উপাচার্য পদে কাউকে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম যোগ্যতা আবশ্যক তার তোয়াক্কা না করে এবং পদ্ধতিগত দিককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেমন খুশি তেমন করে উপাচার্য নিয়োগ চলছিল রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে।

দেশের মধ্যে দেশ: খেলা জমেছে বেশ

দেশ মানে দেশের জনগণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, দেশ মাটি দিয়ে নয়, মানুষ দিয়ে তৈরি। তাই, মানুষ এবং মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিই দেশ গঠন করে। যেমন মানুষের জীবন-জীবিকা, বাঁচার রসদ, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, মানবতা, সহমর্মিতা, আদর্শ, নীতি নৈতিকতা। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষই মুখ্য বিষয়; বাকি সব কিছুই গৌণ। দেশ থাকলে রাষ্ট্র হয়। অর্থাৎ, দেশ রাষ্ট্র গঠন করে, রাষ্ট্র সেই দেশকে শাসন করে বা পরিচালনা করে মাত্র। দেশ শাসন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রাষ্ট্র দেশের কাছ থেকেই পায়। অন্য কথায় দেশ ক্ষমতার জন্ম দেয় এবং ওই ক্ষমতা ব্যবহার করে রাষ্ট্র।

অন্য দিকে, রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্রশক্তি, সরকার ক্ষমতা। রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতার জন্ম দেয় না, কিন্তু ব্যবহার করে। রাষ্ট্র যেহেতু ক্ষমতার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে তাই, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। ক্ষমতা যেমন আধিপত্য, অবদমন, ভয়-ভীতি, কলা-কৌশল, কূটনীতি, সাম-দান-দণ্ড-ভেদ প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চায়, রাষ্ট্রও এই সকল অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে আশ্রয় করে; নিজের আধিপত্য কায়েম রাখতে উদ্যোগী হয়। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কাছে ক্ষমতার এই বৈশিষ্ট্যগুলোই মুখ্য, বাকি সবকিছুই গৌণ। তাই, রাষ্ট্র তার হাতে থাকা ক্ষমতা খাটিয়ে ক্ষমতার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাকে (অর্থাৎ, ক্ষমতার পরিধি, কাল ও তীব্রতাকে) আরও বেশি নিশ্চিত ও মজবুত করতে চায়।

দেশ বনাম রাষ্ট্রের মধ্যে এই চরিত্র এবং উদ্দেশ্যগত দ্বন্দ্ব অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও বাস্তব। দেশ যেহেতু মানুষ দিয়ে তৈরি, তাই সাধারণভাবে দেশবাসী চায় দেশ জিতুক। অন্যদিকে রাষ্ট্রক্ষমতাধারীরা চায় রাষ্ট্র জিতুক। আর যেখানে দ্বন্দ্ব, মানে লড়াই সেখানে তো ক্ষমতার প্রয়োগ অনিবার্যভাবেই চলে আসে। কিন্তু ক্ষমতা যেহেতু দৃশ্যত রাষ্ট্রের কাছে আছে তাই, এই দ্বন্দ্বে দেশ হেরে যায়। কিন্তু দেশের যে অংশ ভুলে যায়নি, যে রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আসলে জন্ম দিয়েছে দেশ, রাষ্ট্র দেশের সেই অংশকে হারাতে পারে না। তবে, দেশের যে অংশ সে সত্যটা ভুলে গেছে বা বোঝার ক্ষমতা নেই তাদের বা বুঝলেও জীবন ধারণের সমস্যাটা সবচেয়ে বড়ো আকার ধারণ করেছে তারা সব জেনে বুঝেও রাষ্ট্রের দোর্দণ্ডপ্রতাপতার সমীপে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এইভাবে দেশ দুটি স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত হয়েছে। (ক) উল্লিখিত মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলির লালন-পালন-প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী একদল সচেতন নাগরিক, (খ) শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে রাষ্ট্র ক্ষমতার অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষি শ্রেণি। এইভাবে এক দেশের মধ্যে দুই দেশ অবস্থান করছে। রাষ্ট্র দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে দেশের সম্পত্তি ও পরিষেবার বন্টনে এতটাই বৈষম্য করা হয়েছে, যে উক্ত দুই দেশের ফারাকটা বিস্তর রূপ নিয়েছে এবং সেটা দিন দিন আরও বেড়ে যাচ্ছে।

এই বিভাজনটা মানসিক তেমন নয়। উল্লিখিত (ক) অংশের দেশের কাছে বিভাজনটা আদর্শগত, কিন্তু (খ) অংশের দেশের কাছে বিভাজনের কারণটা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার প্রয়োজনগত। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক মাসলোর মতে, মানুষের কাছে প্রয়োজনগুলি ক্রম অনুসারে গুরুত্ব পায়। মানুষ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয় তাঁর শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনগুলি মিটাতে। জীবন ধারণের এই অপরিহার্য বিষয় গুলি করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ অন্য কিছুর দিকে মনোনিবেশ করতে পারে না। যাদের এই প্রয়োজনগুলি মিটে গেছে তারা নীতি, আদর্শ, ন্যায়, অন্যায়, মানবতা, দেশ, সংবিধান, রাষ্ট্র ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে পারেন। আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থাৎ খ-শ্রেণির এখনও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনগুলিই মেটেনি। এটা নিশ্চয় রাষ্ট্রের ব্যর্থতা। তাই, তারা প্রত্যাশিতভাবেই, মাসলোর তত্ত্ব অনুসারে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অন্বেষণেই নিজেদের চিন্তা-ভাবনার ও কর্ম-কাণ্ডের পরিধিকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ড. আম্বেদকর প্রণীত আমাদের দেশের সংবিধান যখন সকলকে রাষ্ট্র গঠনে সমান অধিকার (সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার এবং এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মান) দিল তখন, রোটি, কাপড়া আওর মাকানের চিন্তায় নাজেহাল এই খ-শ্রেণিও সেই অধিকার, সম্মান ও দায়িত্বের সমান ভাগ পেলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তারা সেই অধিকারটা বিনিময় করতে চাইলেন তাদের জীবনধারণের প্রথম ও অপরিহার্য প্রয়োজনটা মেটাতে, পেটের ক্ষুধা মেটাতে; একটু খাদ্য, এক টুকরো বস্ত্র বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেতে। রাষ্ট্র ক্ষমতার কারবারিরা সেই সুযোগটুকুর অপেক্ষায় ছিলেন; তারা তড়িঘড়ি ভাত, কাপড়, আবাসের জন্য তাদের পুঞ্জিত বিশাল সম্পদের সামান্যটুকু ছিটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার মূল্যবান চাবিটি অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের (ভোটের) সওদা সস্তায় ক্রয় করে নিলেন।

এই অবস্থায় ক-অংশের পক্ষে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না। তাদের এত আদর্শগত ন্যায্য দাবি-দাওয়া, অবস্থান-বিক্ষোভ, লড়াই-আন্দোলন, হরতাল-অনশন ইত্যাদি কোনো প্রভাবই ফেলতে পারল না দেশের পক্ষে, দেশের সংবিধানের পক্ষে জনমত তৈরি করতে। অন্য দিকে দানের দানা ছিটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত শাসক আরও বেশি মাত্রায় শোষণ-নির্যাতন, মানবতা ও সংবিধান উল্লঙ্ঘন, প্রতারণা-বঞ্চনা-দুর্নীতি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার লাইসেন্স পেয়ে গেলেন; তাদের দ্বারা যাদের উপরে এই নির্যাতন ও অন্যায়গুলো চালানো হবে। তারা জেনে গেছেন যে খ-অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তাদের সমর্থনে আছে এবং বুঝে গেছেন, যে এদের সমর্থন আগামী দিনেও তাদের প্রতি অটুট রয়ে যাবে।

প্রত্যাশিতভাবেই, ক-শ্রেণি রাষ্ট্র শক্তির কু-নজরে পড়েছে। কারণ, তারাই তো রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্র চালকদের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-নির্যাতন বা দেশ ও সংবিধান বিরোধী কাজগুলোকে জন সমক্ষে আনেন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করেন, লক্ষ লক্ষ লোক দিয়ে রাস্তা দখল, শহর এবং গ্রাম দখল, দিন দখল, এমনকি লক্ষ কোটি মোমবাতির আলোকশিখায় রাত দখলের মতো অভিনব, ঐতিহাসিক ঘটনাও ঘটান। এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, যে সমস্ত দেশই (ক এবং খ) রাষ্ট্র-চালকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু, বিষয়টা যে তা নয়, সেটা প্রমাণিত হয় মাত্র দিন কয়েক পরেই অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলে। প্রমাণ হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ খ-শ্রেণি যে রাত দখল, দিন দখল ইত্যাদি প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তারা শুধুমাত্র সামিল হয়েছিলেন, মানবিক দিক দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন মাত্র। কখনই রাজনৈতিক দিক দিয়ে রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্র-চালকের বিরোধীতায় নামেননি। কারণটা সেই একটাই, যে রাষ্ট্র-চালকই তো তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন; জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য রসদ ভাত, কাপড় সরবরাহ করছেন। আগে তো মানুষ বাঁচতে চায়। সুতরাং, রাষ্ট্রের কাছে খ-শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বহু মূল্যবান। অনেকটা কৃষকের গৃহপালিত গবাদি জীবগুলোর মতো। শুধু পেটের ক্ষুধার নিবারণের বিনিময়েই গৃহস্থ তাদেরকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারেন, অন্য কোনো আর দায় নেই তার। আর গৃহপালিত জীবগুলোরও অন্য কোনো চাহিদা নেই। কিন্তু, এইভাবে মানুষকে কি পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হলো না; যাদের পেটের প্রয়োজন ছাড়া আর কোনো প্রয়োজন নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ যখন পেটের প্রয়োজনে মগ্ন থাকে তখন ন্যায়-নীতি, আদর্শ, মানবতা, সত্য, উৎকর্ষতা ইত্যাদির সংরক্ষণ ও কর্ষণ করবে কে? সমস্যাটি আরও জটিল হয় যখন স্বয়ং শক্তিশালী রাষ্ট্র দেশের এরূপ পশুত্ব প্রাপ্তিতে ও সেই স্তরে তার স্থিতাবস্থা রক্ষায় সাহায্য করে। আমাদের মানবসভ্যতার চাকা সামনে ঘুরছে না পিছনে, সহজেই অনুমেয়।

গণতন্ত্রই মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ। আমাদের গণতন্ত্র হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা। এদিকে আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের পশুত্ব প্রাপ্তি হয়েছে। এ অবস্থায়, কী আমাদের ভবিষ্যৎ?

দেশ বনাম রাষ্ট্রের মধ্যে এই চরিত্র এবং উদ্দেশ্যগত দ্বন্দ্ব অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও বাস্তব। দেশ যেহেতু মানুষ দিয়ে তৈরি, তাই সাধারণভাবে দেশবাসী চায় দেশ জিতুক। অন্যদিকে রাষ্ট্রক্ষমতাধারীরা চায় রাষ্ট্র জিতুক। আর যেখানে দ্বন্দ্ব, মানে লড়াই সেখানে তো ক্ষমতার প্রয়োগ অনিবার্যভাবেই চলে আসে। কিন্তু ক্ষমতা যেহেতু দৃশ্যত রাষ্ট্রের কাছে আছে তাই, এই দ্বন্দ্বে দেশ হেরে যায়। কিন্তু দেশের যে অংশ ভুলে যায়নি, যে রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আসলে জন্ম দিয়েছে দেশ, রাষ্ট্র দেশের সেই অংশকে হারাতে পারে না। তবে, দেশের যে অংশ সে সত্যটা ভুলে গেছে বা বোঝার ক্ষমতা নেই তাদের বা বুঝলেও জীবন ধারণের সমস্যাটা সবচেয়ে বড়ো আকার ধারণ করেছে তারা সব জেনে বুঝেও রাষ্ট্রের দোর্দণ্ডপ্রতাপতার সমীপে মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

মুহম্মদ আফসার আলী

অধ্যক্ষ, খুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা

রাজনীতি

কেন কোনো কোনো সংবাদপত্র বর্জনীয়

মীর রেজাউল করিম

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশে আরও অনেক বিষয়ের মতো সংপাদপত্রেরও প্রচলন ছিল না। শোনা যায়, মুঘল রাজ দরবারে হাতে লেখা সংবাদপত্রের ব্যবহার ছিল। যদি বিষয়টি সত্যও হয় তাতেও আধুনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে তার কোনো তুলনা চলে না। বস্তুত উত্তর পলাশি যুদ্ধ পর্বে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অভিঘাতে এদেশে সংবাদপত্রের পথ চলার সূচনা। প্রথমে মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পরে সংবাদপত্রের প্রবর্তন।

পলাশির যুদ্ধ সূত্রে কার্যত রাজ তখতে অধিষ্ঠিত হওয়া ইউরোপীয় বেনিয়ারা এদেশের মানুষকে যা কিছু উপহার স্বরূপ দিয়েছেন তার মধ্যে অনেক কিছুর মতো সংবাদপত্রও অনেক ভালোর পাশাপাশি বিশেষ এক মন্দকে আবাহন করে এনেছিল; আর তা হল সাম্প্রদায়িকতা। উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে যে সাম্প্রদায়িকতার বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তার মূলে সংবাদ—সাময়িকপত্রের সবিশেষ ভূমিকা ছিল। ইংরেজ রাজের মস্তিষ্ক প্রসূত সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি সেদিন এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওভাবে সঞ্চারিত হতে পারতো না, যদি না প্রচলিত সংবাদপত্রকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করার সুযোগ পেতেন সাম্প্রদায়িকতার কারবারিরা। আর সেদিন সেই যে অভিশপ্ত বাস্তবতার সূচনা হয়েছিল তার থেকে আমাদের মুক্তি ঘটেনি আজও। অনেকেই মনে করেন, সেদিন ছেচল্লিশের দাঙ্গা অমন ভয়াবহ রূপ নিতে পারতো না যদি না সংবাদপত্রের হাত ধরে অর্ধসত্য ও অসত্যকে সত্যের পোশাকে সজ্জিত করা যেত।

এখন অবস্থার অনেক বদল হয়েছে নিশ্চয়ই। তখন সংবাদপত্রই ছিল অদ্বিতীয় প্রায় প্রচার মাধ্যম। এখন সংবাদপত্রের প্রভাবকে অতিক্রম করে প্রতিদিনই আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সামাজিক মাধ্যম সমূহ। তবু তারপরেও সংবাদপত্রের গুরুত্বের যে বিশেষ হানি হয়েছে তা বলা যাবে না। এখনও সমাজ জীবনে সংবাদপত্রের যথেষ্ট অভিঘাত রয়েছে এবং এই অভিঘাতকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন সুবিধাবাদী একটা শ্রেণি। তাঁরাও একঅর্থে সাম্প্রদায়িকতার কারবারি। আমরা পরে আসছি সেকথায়।

বুধমণ্ডলীর মধ্যে কান পাতলে এই কথাটা মাঝেমধ্যেই নানাভাবে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। একটি কাগজ নাকি পড়তেই হয়, উপযুক্ত গুণমান সম্পন্ন লেখার স্বাদ গ্রহণ করার জন্য। অন্য কোনো কাগজের আর কোনো লেখাই নাকি এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। যদিও ওদের অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছে, তবুও স্বীকার্য যে, কথাটা নিছক অনস্বীকার্য নয়। ভালোমানের বাংলা রচনার প্রধান ঠিকানা ওটাই বা ওই জাতীয় আরও দুই একটা। তবু তারপরেও আমরা আমাদের অবস্থান বা বক্তব্যে অনড়। এসব কাগজ সত্যিই বর্জনীয়।

আসলে উৎকৃষ্ট মানের গদ্যচর্চা একটা সংবাদপত্রের ভালোগুণ অবশ্যই। তবে এই গুণপনা কখনোই প্রথম ও প্রধান কথা হতে পারে না। সংবাদপত্রের শ্রেষ্ঠত্বের মূল নিহিত থাকে সৎ আদর্শবাদী বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার গভীরে। সেদিক থেকে বিচার করলে উদ্দিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদপত্রগুলি খুব সম্ভব পিছনের দিক থেকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অবস্থান করবে। সৎ ও আদর্শ নিষ্ঠ সাংবাদিকতার ধারণাকে এখানে মান্য করা হয় না একেবারেই। সাংবাদিকতার মৌল নীতি কে অমান্য বা পদদলিত করাতেই অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন এইসব কাগজের কর্তাব্যক্তিরা। ওদের কোনো দ্বিধা নেই। যেনতেন ভাবে নিজেদের মত পথের পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করাই তাদের কাছে শেষ কথা। তার জন্য সময়ে সময়ে সত্য বা মিথ্যা এবং লাল-নীল-গেরুয়া, যে কোনো রঙের পোশাক গায়ে চড়াতে তাদের মধ্যে ন্যূনতম কোনো তঞ্চকতা নেই। নিজেদের অবস্থানে ও লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যে তারা এতটাই আপোষহীন যে, এর জন্য সম্ভাব্য সমস্ত সর্বনাশকেও মাথা পেতে গ্রহণ করতে দ্বিধাহীন।

হলুদ সাংবাদিকতা বলতে যা বোঝায় তারাই একালের সংবাদপত্র ক্ষেত্রে এর বীজ উপ্ত করেছিলেন এবং এ কাজে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন।

এখন অবস্থা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, প্রকৃত সত্য সত্য নয়; তারা যেটাকে সত্য বলে মনে করছেন সেটাই সত্য; এর বাইরে আর যা কিছু সত্য রয়েছে তা যেন সত্যের ছায়ামাত্র; তাদের কাগজ পড়তে পড়তে অন্তত তাই মনে হয়। বাল্মীকি রামায়ণ-এর নেপথ্য ইতিহাস হিসেবে যে বৃত্তান্ত প্রচলিত রয়েছে, অর্থাৎ 'কবি তুমি তোমার মনোভূমি রাম জন্মভূমি অযোধ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেন' তাকেই যেন আপ্তবাক্যের মতো করে গ্রহণ করেছেন তারা। তারা ঘটমান সত্যের বৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন না, তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার বা বাস্তবের বিকৃত ভাষ্য রচনা করেন, প্রয়োজনে মূল ঘটনাকেও রচনা করে নেন।

এখানেই শেষ নয়। এদের কাগজ পড়তে পড়তে যেন আরও মনে হয়: আমাদের এই বাংলা, বাংলার মধ্যেকার কলকাতা, দূরবর্তী হিসেবে দিল্লি সহ দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি শহর: এর বাইরে আর কোনো পৃথিবী নেই। সেখানকার মানুষজনের কোনো জায়মান জীবন আছে ও সেই জীবনও আলোচ্য বিষয় হতে পারে, তা যেন মনেই হয় না এইসব কাগজ হাতে নিয়ে। কোথায় কি কেচ্ছা হয়েছে। কোন সেলিব্রেটির বউ কার সঙ্গে লটঘট করছে ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনে অতি উৎসাহ তাদের।

যে কোনো উৎকৃষ্ট মানের সংবাদপত্রের থাকে, অন্তত থাকা উচিত আন্তর্জাতিক খবরা খবর বিষয়ক একটা পাতা। কিন্তু কোথায় সেই পাতা! কখনো কখনো বিশেষ কিছু আন্তর্জাতিক খবর পরিবেশন করে তারা ধন্য করেন তাদের পাঠক সমাজকে। এসব কিছুর পরেও তারা দাবি করেন, তারাই সেরা এবং অনেকেই তাদের সে দাবিকে শিরোধার্য করে নেন।

একটু খতিয়ে দেখলে প্রতিপন্ন হয়; এই যে, যারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে শিরোধার্য করে নিয়েছেন, এরা বিশেষ সুবিধাবাদী শ্রেণি। তারা আর সব দিককে দেখেও না দেখার ভান করেন এবং জোর গলায় বলার চেষ্টা করেন, যে লেখার গুণপণার দিক থেকে কাগজটির তুলনা হয় না। কাজেই একে অস্বীকার করা মানে নিজেকে অপমান করা; নিদেনপক্ষে পিছিয়ে পড়া, পিছিয়ে থাকা। তাদের এমন বক্তব্য আসলে সত্যের কঙ্কালসার অবস্থা মাত্র। লেখার গুণগত মান সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে শেষকথা হতে পারে না। বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশনই সংবাদপত্রের জন্য মূল কথা। লেখার গুণগত মান প্রধান বিচার্য হয় সাময়িকপত্রের সাপেক্ষে। মনে রাখা জরুরি, সংবাদপত্র সাময়িকপত্র নয়। সংবাদপত্র দায়বদ্ধ দেশ বা জাতির বিবেককে ক্ষুরধার করার জন্য; একে প্রজ্জ্বলিত রাখার ব্যাপারে। মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের দায় সংবাদপত্রের নয়। এই দায় বহন করার জন্য সাময়িকপত্র সমূহ রয়েছে।

সংবাদপত্রের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর মতোই নিত্য। কেউ কাউকে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের ভিড়ে হারিয়ে যাবে সংবাদসমূহ; রীতিমতো খুঁজে পেতে বার করতে হবে মুখ লুকিয়ে থাকা সংবাদগুলিকে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় কোনো সংবাদ নেই; রয়েছে শুধুই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের দুয়ার অতিক্রম করে তবে পা রাখা যাবে সংবাদপত্রের অন্দরে। মাঝেমধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়, এসব সংবাদপত্র না বিজ্ঞাপনপত্র। বাংলায় সংবাদপত্রকে এভাবে বিজ্ঞাপনপত্রে পরিণত করার রীতি তারাই প্রচলন করেছিলেন; এখন এই বিজ্ঞাপন জ্বরে আক্রান্ত অধিকাংশ বাংলা কাগজ। আর বিজ্ঞাপনের রুচিহীনতা নিয়ে যত কম কথা বলা যায় ততই শ্রেয়। এমন অনেক বিজ্ঞাপন এখন পত্রিকার পাতা জুড়ে আলোকিত হয়ে থাকছে যা পরিবারের আর সকলের সঙ্গে সমান ভাবে ভাগ করে নেওয়া যাচ্ছে না। সংবাদপত্র পাঠ করার সময় ছেলে মেয়েদের থেকে যেন কিছুটা আড়াল নিতে হচ্ছে। বিজ্ঞাপন বিষয়ক আমাদের এই বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হয়তো সহমত হবেন না অনেকেই। তারা এটাকেই যুগরুচি হিসেবে দেখছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সমস্যা হল, এখনও আমাদের মধ্যে এমন হাজারও মানুষ রয়েছেন যারা, তাদের মতো আধুনিক বা আধুনিকা হয়ে উঠতে পারেননি। তাদের এই বাস্তব সমস্যার দিকটি তাই অনস্বীকার্য।

সবশেষে আর একটি কথা। কোনো কোনো বাংলা সংবাদপত্র বিশেষত উদ্দিষ্ট সব কাগজগুলি যেন এই বঙ্গের মুসলিম সমাজের সঙ্গে একটা দ্রোহের সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে প্রথমাবধি মুসলমান সমাজের পক্ষে ইতিবাচক বা গৌরবজনক কোনো সংবাদ এইসব কাগজে থাকে না বললেই চলে। এদিকে মুসলমান সমাজে অগৌরবের কোনো বৃত্তান্ত সংঘটিত হলে তা কভার করার জন্য তাদের উৎসাহের পরিসীমা থাকে না। একটাই বৃত্তান্তকে দিনের পর দিন ফেনিয়ে ফেনিয়ে পরিবেশন করা হয়। এ কাজে কাগজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা সত্যিই প্রশ্নাতীত। এমন অবস্থায় মুসলমান সমাজের পক্ষে এই সব কাগজের পৃষ্ঠপোষকতা করা 'মৃত ভাই এর মাংস ভক্ষণ করার সমতুল বলে মনে হয়।

এখন অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন। মুসলমান সমাজেও তৈরি হয়েছে বেশ একটা পাঠক শ্রেণি। এই শ্রেণিকে তুষ্ট করার জন্য মাঝে মধ্যে একটু আবেগাত্মক উত্তর সম্পাদকীয় পরিবেশন করা হচ্ছে। দেখে শুনে যেন মনে হয় দরদ উথলে উঠছে। আসলে এসবই মেকি। প্রবল প্রহার করার পর মুখে আহা উহু করে সমবেদনা প্রকাশ করা বা বড়োজোর একটু মলম লাগিয়ে দেওয়ার অতিরিক্ত আর কিছু বলে এসব কিছুকে বিবেচনা করা চলে না। কাজেই এমন সহানুভূতিতে গলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না; এটা করা হলে তা হবে প্রবল আহাম্মুকি।

সংবাদপত্র জনসাধারণের সামাজিক-রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিষয়টি যেন লাগাম ছাড়া না হয়ে যায়। সংবাদপত্র যদি স্বধর্ম থেকে সরে এসে ও সামষ্টিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্য থেকে চ্যুত হয়ে সংকীর্ণ কোনো স্বার্থকে প্রধান উপজীব্য করে তবে ওই সংবাদপত্র বা পত্রগোষ্ঠীকে সবক শেখানোরও আবশ্যকতা রয়েছে। তা না হলে সমূহ সর্বনাশের সম্ভাবনা-পথ প্রশস্ত হতে বাধ্য।

বুধমণ্ডলীর মধ্যে কান পাতলে এই কথাটা মাঝেমধ্যেই নানাভাবে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। একটি কাগজ নাকি পড়তেই হয়, উপযুক্ত গুণমান সম্পন্ন লেখার স্বাদ গ্রহণ করার জন্য। অন্য কোনো কাগজের আর কোনো লেখাই নাকি এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। যদিও ওদের অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছে, তবুও স্বীকার্য যে, কথাটা নিছক অনস্বীকার্য নয়। ভালোমানের বাংলা রচনার প্রধান ঠিকানা ওটাই বা ওই জাতীয় আরও দুই একটা। তবু তারপরেও আমরা আমাদের অবস্থান বা বক্তব্যে অনড়। এসব কাগজ সত্যিই বর্জনীয়।

সংস্কৃতি

সরকার পোষিত মাদ্রাসা: পর্যালোচনা

প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময় থেকে শুরু হয়ে ছিল প্রকাশ্য মঞ্চেই। উচ্চকিত হয়েছিলেন তিনি—মাদ্রাসাগুলো সন্ত্রাসীদের আখড়া বলে মনে হয়েছিল তাঁর। অতঃপর কথাস্রোত প্রবাহিত হয়েছে নানা খাতে; প্রতীপে, বিপ্রতীপে কোনো দিক থেকেই কম কথা বলা হয়নি। একদল যেমন উঠে পড়ে

এ টি এম সাহাদাতুল্লাহ

সহকারী অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ

দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে চিত্রটা একটু অন্যরকমের হলেও উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর শেষ নেই। পাঁচ হাজারের উপর পড়ুয়া রয়েছে এমন মাদ্রাসার সংখ্যা করাঙ্গুলে গণনীয় নয়। এই সব মাদ্রাসায় পরিকাঠামোগত সমুন্নতি চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। মুর্শিদাবাদ জেলার ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসা তো বহু কলেজকেও লজ্জা দেবে। কারও কারও মনে হতে পারে, হাই মাদ্রাসার অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও সিনিয়র মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। বিষয়টা কিন্তু একেবারেই তা নয়। মুর্শিদাবাদ, লালগোলা অঞ্চলের একটি মাদ্রাসা পরিকাঠামো ও পঠন পাঠনের মানের দিক থেকে কোনো হাই স্কুলের থেকে কিছু মাত্র কম যায় না। এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন, মাদ্রাসা, গুলোতে সত্যিই সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এগুলো আক্ষরিক অর্থেই সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় ঘর; অন্য দিকে তেমনি অন্য পক্ষ বলিষ্ঠ তথ্য সহযোগে প্রতিপন্ন করেছেন, এসব আসলে ডাহা মিথ্যা কথা; এ রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষণ ব্যবস্থা একটা সমান্তরাল শিক্ষণ পরিকাঠামোর অতিরিক্ত কিছু নয়; আলাদা করে কোনো অন্যায় বা অনৈতিকতা প্রশ্রয় পায় না এখানে। বলার আপেক্ষা রাখে না; এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষের এই অভিমত তল পায়নি সেভাবে। মানসিক সক্ষমতা, লোকবল, অর্থবল প্রভৃতি সহযোগে প্রথম পক্ষ তাদের বক্তব্যকে অনেক বেশি করে চাউর করে দিতে পেরেছেন, তাদের পক্ষে প্রবল জনমত তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। আর সে কারণেই, আজও কথার শেষ নেই। মূলধারার সংবাদ-মাধ্যম ও সমাজ মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা, নিন্দে-মন্দের ঢেউ বয়েই চলেছে। এই নিন্দা-স্রোতের বিপরীতে। দাঁড়িয়ে অনেক কিছুই বলার থাকতে পারে। তবে সেসব কথা বলার লক্ষ্যে এই নিবন্ধের অবতারণা নয়। আমরা এক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিতে চাইছি একটি বিষয়ে-খারেজি বা কওমি মাদ্রাসার বাইরে এ রাজ্যে আরও যে কিছু মাদ্রাসা বর্তমানে রয়েছে, যা মুখ্যত রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয় তার উপরে। কী পড়ান হয় এই সমস্ত মাদ্রাসায়, কারা পড়ে এখানে: পড়ানই বা কারা, পড়াশুনার মান ও সামগ্রিক গুণমান কেমন? এসবই আমাদের মূল উপজীব্য।

প্রথমেই আসা যাক পাঠক্রমের কথায়। পাঠক্রমের কথা বলতে হলে অবশ্যই হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার কথা আলাদা করে বলতে হবে। হাই মাদ্রাসার পাঠক্রমে বিশেষ বিভিন্নতা নেই বললেই চলে। আরবি সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক দুটি অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে মাত্র। এই দুই বিষয়ের মধ্যে একটির গুরুত্ব আবার যৎসামান্য; পড়তে হয় মাত্র; পাশ না করলেও চলে। সিনিয়র মাদ্রাসায় অবশ্য মূল ধারার সমস্ত বিষয়ের পাশাপাশি বেশ কিছু অতিরিক্ত বিষয়ও পড়ান হয় এবং সেগুলি ইসলাম ধর্মতত্ত্ব সম্মত। অর্থাৎ পাঠক্রমে বিরাট কোনো বিভিন্নতা বা বিসদৃশতা নেই।

পাঠক্রমে তেমন বিভিন্নতা না থাকার কারণে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যে কারও পক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায়, বিশেষত হাই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে এবং এর প্রচলনও রয়েছে যথেষ্ট মাত্রায়। মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার এমন অনেক মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে অমুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক জন দুই জন নয়, শত শত। এখানে অনেক ক্ষেত্রেই অমুসলিম অভিভাবকরা পার্শ্ববর্তী স্কুলে ভর্তি না করিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসাতে ভর্তি করান। মালদার কালিয়াচক অঞ্চলের মোহাম্মাদীয়া হাই মাদ্রাসায় যেমন হয়। কেবল মালদা, মুর্শিদাবাদ কেন; কলকাতার অদূরে হাতিশালায় যে একটি হাই মাদ্রাসা রয়েছে সেখান থেকে পড়াশুনা করেছে তিথি মন্ডল ও ২০১৭ সালে মাদ্রাসা বোর্ডের সর্বোচ্চ পরীক্ষা বা মাধ্যমিকে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, বিভিন্ন বছরে মাদ্রাসা বোর্ডে স্ট্যান্ড করছে অমুসলিম শিক্ষার্থীরা। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে চিত্রটা একটু অন্যরকমের হলেও উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর শেষ নেই। পাঁচ হাজারের উপর পড়ুয়া রয়েছে এমন মাদ্রাসার সংখ্যা করাঙ্গুলে গণনীয় নয়। এই সব মাদ্রাসায় পরিকাঠামোগত সমুন্নতি চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। মুর্শিদাবাদ জেলার ভাবতা আজিজিয়া হাই মাদ্রাসা তো বহু কলেজকেও লজ্জা দেবে। কারও কারও মনে হতে পারে, হাই মাদ্রাসার অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও সিনিয়র মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। বিষয়টা কিন্তু একেবারেই তা নয়। মুর্শিদাবাদ, লালগোলা অঞ্চলের এক একটি মাদ্রাসা পরিকাঠামো ও পঠন পাঠনের মানের দিক থেকে কোনো হাই স্কুলের থেকে কিছু মাত্র কম যায় না। এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। মনে রাখতে হবে, সব হাই স্কুলও কিন্তু উপযুক্ত গুণমান সম্পন্ন নয়। কোনো কোনো হাই স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কাজেই গুণমানের কথা বলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেগে দেওয়া, সুস্থ চেতনার পরিচয় নয়।

মাদ্রাসায় পাঠদানের কাজ করবেন যে শিক্ষক শিক্ষিকামণ্ডলী তাঁদের নিয়োগ অবাধে ও গুণগত মান বজায় রেখে যাতে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের সমান্তরালে কার্যকর রয়েছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। যখন সব কিছু স্বাভাবিক ছিল তখন স্কুল সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়া হত মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকেও। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সাংঘাতিক দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে তা স্পর্শ করতে পারেনি। তাই স্কুল সার্ভিস কমিশনকে ঘিরে অচলাবস্থা তৈরি হলেও মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন কিন্তু স্বমহিমায় বর্তমান আছে এবং নিয়মিত ব্যবধানে পরীক্ষা নিচ্ছে, নিয়োগপত্র দিচ্ছে।

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যেভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হচ্ছেন সেখানে নেই কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ। মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকেই অবাধে নিযুক্ত করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে কমবেশি ত্রিশ শতাংশ অমুসলিম সমাজের সদস্য। কেবল সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা নন, প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও অনেকেই অমুসলিম। তাঁরা গৌরবের সঙ্গে তাঁদের কাজ করে চলেছেন।

সব মাদ্রাসায় না হলেও অধিকাংশ হাই মাদ্রাসাতে রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য স্তরের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা অবশ্য উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পঠন পাঠনের জন্য নেই সমতুল কোনো বোর্ড। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধীনেই পরিচালিত হয় উচ্চমাধ্যমিকের পঠন পাঠন। এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষত সিনিয়র মাদ্রাসাগুলির দিক থেকে বিশেষ সমস্যা হয়। সিনিয়র মাদ্রাসায় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় যেসব বিষয়ে পাঠদানের আবশ্যকতা রয়েছে তার সুবন্দোবস্ত নেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কাছে। ফলত পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এর মতো পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক মাদ্রাসা সংসদের আবশ্যকতা রয়েছে। আমাদের দেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রয়েছে একাধিক পরিচালক সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদও অনুরূপ একটি পরিচালক সংস্থা। এই সংস্থার অবশ্যই কিছু নিজস্বতা রয়েছে এবং এই নিজস্বতা যে অত্যন্ত ইতিবাচক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে মূল্যবোধের শিক্ষা এখন বিশেষ আলোচ্য, শিক্ষানীতি ২০২০ তে সবিশেষ গুরত্ব দেওয়া হয়েছে যে মূল্যবোধের শিক্ষার উপর, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় তা প্রথমাবধি প্রাধান্য পেয়ে আসছে। শিক্ষাঙ্গনে মূল্যবোধাত্মক সাধারণ প্রতিবেশ রচনার পাশাপাশি পাঠক্রম নির্ধারণ ও পাঠ্যবিষয় নির্বাচনেও সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় মূল্যবোধের উপর।

শিক্ষা

একটা কথা প্রায়শ বেশ জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করা হয় কোনো কোনো পক্ষ থেকে, যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। এখান থেকে সর্বোচ্চ পরিষেবা প্রাপ্ত হয় না শিক্ষার্থীরা এমন অভিযোগ একেবারেই যথার্থ নয়। তবে এটা ঘটনা যে, স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যে গুণমান সম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্ম হয় মাদ্রাসা ব্যবস্থা সামগ্রিক ভাবে তার থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছে। মনে রাখতে হবে, এই পিছিয়ে থাকার মূল মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার গভীরে নিহিত নেই; এর মুল প্রোথিত রয়েছে আমাদের সমাজ জীবনের গভীরে।

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তারা মোটের উপর পিছিয়ে পড়া শ্রেণি থেকে উঠে আসা। সামাজিক মানদণ্ডের নানান মাপকাঠিতে তারা অন্য অনেকের থেকে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে গুণগত দিক থেকে সবসময় সমমানের হয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। আসলে, এই সম্ভব না হওয়া বা সমস্যা থেকে গেছে বলেই তো আলাদা করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ। এভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা ও তার বাস্তবায়ন ভারতীয় সংবিধানের মূল নীতি। ভাবতে অবাক লাগে, যারা ভারতীয় সংবিধানকে শিরোধার্য করে শপথ বাক্য উচ্চারণ সহযোগে রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তারাই একদিকে যেমন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার অবসানের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন অন্যদিকে তেমনি সংবিধানের সংরক্ষক হিসেবে অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি অনুভব করছেন। বিষয়টা যেন ক্রমেই প্রহসনে পরিণত হচ্ছে।

উমর খালিদ ও আমাদের দায়বদ্ধতা

উমর খালিদ এখনও জেলবন্দি। কিন্তু কেন। সদুত্তর নেই অনেকের কাছেই। নিশ্চয়ই একটা কিছু কারণ রয়েছে না হলে জেলে বন্দি করে রাখা হবে কেন। এত সব মানুষ দিব্যি রয়েছে। কাউকেই কিছু বলা হচ্ছে না, খামোখা একটা ছেলেকে ওভাবে বন্দি করে রাখা হবে কোন যুক্তিতে। তার উপর এতদিন ধরে। গুরুতর কোনো কারণ না থেকে পারে না। এমনভাবে ভাবছি, ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা অধিকাংশ জন। তাই আমাদের কারোরই তেমন মাথাব্যথা নেই। এখন কথা হল, এভাবে মাথাব্যথা থেকে মুক্ত থাকা কতখানি সঙ্গত। তার চেয়েও বড়ো কথা; এই পথে কতদিন মাথাব্যথা-মুক্ত থাকা যাবে।

এক্ষেত্রে সময়ের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট। এই পথে পা রেখে শেষাবধি স্বস্তি পাওয়া যায়নি। মুক্ত থাকা যায়নি অসহ্য যন্ত্রণা ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে। আর সেটাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিক বিপন্নতার জাল ছিঁড়ে যদি বা কোনোরকমে বেরিয়ে আসা যায়; এইপথে সামষ্টিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না কিছুতেই। সাতচল্লিশের অব্যবহিত পরের কথা। দেশ তখন স্বাধীন; পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আনন্দে উদ্বেল ভারতবাসী। কিন্তু এই ভারতবাসীর

সাইফুল্লা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

একটা শ্রেণি সেই আনন্দে গা ভাসাতে পারলো না কিছুতেই। তাদেরকে যারপরনাই বিপর্যস্ত হতে হল ইউএপিএ এর প্রভাবে। যার তার উপর লাগু করা হতে থাকলো এই আইন। সমাজের অগ্রগণ্য ও বরেণ্য বক্তিবর্গকে টার্গেট করা হল বিশেষ করে। গ্রেপ্তার করা হল সৈয়দ বদরোদ্দজার মতো মানুষকেও। তাঁর মতো প্রবল জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব সেদিন বোধহয় দ্বিতীয় ছিলেন না। যখন দেশত্যাগের রীতিমতো হিড়িক চলছে তখন সীমান্ত পেরনোর ভাবনা যার মনে এতটুকুও ছায়াপাত করেনি তাঁকেই গ্রেফতার করা হল জাতীয় নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে। এর থেকে অন্যায় আর কী হতে পারে।

উত্তর সাতচল্লিশ পর্বে সৈয়দ বদরোদ্দজা যে কয়দিন বেঁচেছিলেন তার অধিকাংশই অতিবাহিত হয়েছিল জেলখানায় বা নজরবন্দি অবস্থায়। বলা বাহুল্য, অসহনীয় ছিল সে জীবন। এমন অবস্থায় অধিকাংশ মানুষ নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন, বিনষ্ট হয় বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। সৈয়দ বদরদ্দোজার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি বলে মনে হয়। তাঁর এই পরিণতি ও আজকের ওমর খালিদদের জীবনবাস্তবতা, এসবই কিন্তু বিশেষ একসূত্রে বাঁধা; সবই কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পৃক্ত। আর এই কার্যকারণ সম্পর্কের চালিকাশক্তি হল রাষ্ট্রশক্তি।

রাষ্ট্রশক্তির অধিকারীরা যা মনে করেন তার বাইরে আর কোনো সত্যই সেই অর্থে সত্য নয়। একটা সময় ছিল যখন তাদের মুখের কথাই ছিল শেষকথা: তৎপ্রসূত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। মানুষের জীবন মরণের সবটাই নির্ভর করতো তাদের মর্জির উপর। তাদের সামান্য অঙ্গুলি হেলনেই ইতি হত শত সহস্র মানুষের জীবনের। এখন অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন বা উন্নতি হয়েছে। ওভাবে আর বেমক্কা মরণ পথের যাত্রী হতে হয় না সাধারণ মানুষকে। তবে ওইটুকুর বাইরে আর যে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি, তাও কিন্তু স্বীকার্য। তা যদি না হত তবে ওমর খালিদরা আজ জেলবন্দি এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত কারবারিরা জেলখানার বাইরে থাকতো না।

সেই গোধরা কাণ্ড থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এদেশে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে তার সাপেক্ষে কোনোরকম কোনো শাস্তি হয়নি একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের। বড়জোর সামান্য কিছু দিন আটক রাখার পর বেকসুর খালাশ করে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। ক্ষেত্রেবিশেষে সাড়ম্বরে বিশেষ সামাজিক মর্যাদায় ভূষিতও করা হয়েছে। অথচ সাধারণ অভিজ্ঞতা বলছে, এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক।

উত্তর সাতচল্লিশ পর্বে সৈয়দ বদরোদ্দজা যে কয়দিন বেঁচেছিলেন তার অধিকাংশই অতিবাহিত হয়েছিল জেলখানায় বা নজরবন্দি অবস্থায়। বলা বাহুল্য, অসহনীয় ছিল সে জীবন। এমন অবস্থায় অধিকাংশ মানুষ নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন, বিনষ্ট হয় বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। সৈয়দ বদরদ্দোজার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি বলে মনে হয়। তাঁর এই পরিণতি ও আজকের ওমর খালিদদের জীবনবাস্তবতা, এসবই কিন্তু বিশেষ একসূত্রে বাঁধা; সবই কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পৃক্ত। আর এই কার্যকারণ সম্পর্কের চালিকাশক্তি হল রাষ্ট্রশক্তি।
রাষ্ট্রশক্তির অধিকারীরা যা মনে করেন তার বাইরে আর কোনো সত্যই সেই অর্থে সত্য নয়।

যাদের স্বাভাবিক নিয়মে শাস্তি পাওয়ার কথা ছিল তার আইনের ফাঁক দিয়ে দিব্যি গলে যাচ্ছে অথবা গলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। আর যাদের শাস্তি পাওয়া স্বাভাবিক নয় বলে মনে হয়েছে তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হচ্ছে আইনের বাঁধনে। তার জন্য প্রচলিত আইনের নতুন ভাষ্য রচনা করা চলছে; প্রয়োজনে প্রণয়ন করা হচ্ছে নতুন নতুন সব আইন। সাধারণ সত্যের বাইরে এই যে ব্যতিক্রমী সত্যের সীমানা প্রসারিত হচ্ছে তা শেষাবধি কোথায় গিয়ে শেষ হবে নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টা সহজে শেষ হওয়ার নয়। জল গড়াতে পারে আরও অনেক দূর পর্যন্ত।

এখন যারা রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করছেন তারা মত পথ ও চিন্তা চেতনার দিক থেকে অনেকটাই আলাদা। তাদের মত পথ ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা তাদের একদেশদর্শী মানসিকতার বাইরে আর কোনো কিছুকেই মান্যতা দিতে রাজি নয়। এই অবস্থায় সমূহ সর্বনাশের সম্ভাবনা প্রকটতর হচ্ছে। এমন সর্বনাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সব দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে আরও বেশি করে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা; কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা আসলে আত্মহননেরই নামান্তর। এভাবে, এইপথে শেষরক্ষা হবে না। কাজেই প্রতিবাদী হতে হবে; প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সম্ভাব্য সব দিক থেকে।

যে দিল্লি দাঙ্গার ঘটনা পরম্পরায় আটক রাখা হয়েছে ওমর খালিদ সহ আরও কাউকে কাউকে, তারা সকলেই প্রায় মুসলমান সমাজের। এদিকে খোলা চোখে আমাদের বোধ-দর্পণে যা প্রতীয়মান হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্ট যে, দিল্লি দাঙ্গার সূত্রে মার খেয়েছে, মরেছে, সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে প্রথমত ও প্রধানত মুসলমানদের। অন্যপক্ষের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বললেই চলে। দিল্লির এই ঘটনাকে সেভাবে দাঙ্গাও বলা চলে না। এ হল আসলে একমুখী নিধন। এক পক্ষ মেরেছে, অন্য পক্ষ মার খেয়েছে: জীবন দিয়েছে। যারা মার খেল, যাদেরকে জীবন দিতে হল তাদেরকেই আবার অভিযুক্ত হতে হয়েছে; জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে। তারা নাকি দাঙ্গায় প্ররোচনা দিয়েছে।

দাঙ্গায় মদত দিয়েছে। এ এমন এক অভিযোগ, যা যথার্থভাবে প্রতিপন্ন হওয়ার নয়। এক্ষেত্রে অভিযোগের সারবস্তু প্রতিপন্ন করার দায় ততটা বর্তায় না অভিযোগকারীর উপর কোনোক্রমে অভিযোগের ঢিলটা ছুঁড়ে দিতে পারলেই হল। লাগলো তো কেল্লাফতে; না লাগলেও কুছ পরোয়া নেহি। প্রয়োজন মতো অমন কত শত অভিযোগের বিষ মিশ্রিত বাণ নিক্ষেপ করা যাবে। এদিকে এমন অভিযোগের ঢিলকে পাথেয় করেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে যা কিছু করার সম্পন্ন করা হচ্ছে সুচারুভাবে।

যারা ক্ষতিগ্রস্থ, যারা মার খেল সর্বাত্মকভাবে, তারাই দাঙ্গায় ইন্ধন যোগালো- এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে। আসলে সম্ভব অসম্ভব বলে এখানে কোনো কিছুই প্রযোজ্য নয়। একমাত্র প্রযোজ্য বাস্তব হল, ক্ষমতাসীন পক্ষের ইচ্ছা, তারা যা মনে করছেন সেটাই শেষকথা। তার বাইরে আর কোনো কথা নেই।

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, ক্ষমতাসীন পক্ষের এই স্বেচ্ছাচারিতায় তাদের কিছু যায় আসে না। কাজেই তাদের দিক থেকে আলাদা করে হয়তো কোনো করণীয় নেই; কিন্তু অন্য অনেকের ক্ষেত্রে তো তা নয়। তাদের অনেক কিছুই যেতে আসতে পারে এর ফলে। সহায় সম্পত্তি, মান সম্মান থেকে শুরু করে জীবন মরণ; বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্তই। কাজেই তাদের জন্য নেই এক মুহূর্তেরও কোনো অবসর। তাদেরকে যথাসম্ভব সচেষ্ট হতে হবে।

সমাজ

মনে রাখতে হবে, তাদের পক্ষের শত সহস্র, লক্ষ কোটি মানুষ কারাগারের বাইরে বা মুক্ত থাকলেও তাতে ক্ষমতাসীন পক্ষের কিছু যায় আসে না: এরা তাদের বিচারে সংখ্যা মাত্র; প্রায় না মানুষ পর্যায়ের মানুষ। তাদের যা কিছু মাথা ব্যথা তা ওই ওমর খালিদ বা তাদের মতোদের নিয়ে। যারা জায়মান শক্তির চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে; প্রশ্ন করতে পারে; দাঁড় করাতে পারে গভীর জিজ্ঞাসার সম্মুখে। ওরা অপরাধী তাই ওরা কোনোরকম কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে সাহস করে না। এড়িয়ে যেতে চায় যাবতীয় অপ্রিয় বাস্তবকে। সেই অনুসারে পরিকল্পনার জাল বিস্তার করে তারা সুপরিকল্পিতভাবে কিছু প্রাপ্তিযোগের ফাঁদ পেতে রাখে। এই ফাঁদে পা দিয়ে যত লোক তাদের বশীভূত হয়ে থাকবে ততই তাদের মঙ্গল।

ওরা ওদের মতো করে ফাঁদ পাতছেন ও আগামীতে আরও বেশি করে পাতবেন বলেই মনে হয়। এতে আর্ত পক্ষের আলাদা করে কিছু করার নেই। তবে তাই আরও বেশি করে নজর দিন নিজেদের উপর। সম্ভাব্যতার সীমা বরাবর প্রসারিত করে দিন নিজেকে, নিজেদেরকে। নিজেকে একান্ত করে সেঁকে নিন সাংবিধানিক পথে গৃহীত সম্ভাব্য সব ধরনের প্রতিবাদের আগুনে। তাতে যদি ঝলসে যায় দেহ মনের পাশাপাশি আরও অনেক কিছু, তবে তাই হোক। তবু অন্যায়ের সঙ্গে কোনোরকম আপোষ নয়। নয়, কোনো প্ররোচনায় পা দেওয়া বা অনাকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে প্রাণিত হওয়া। সাংবিধানিক পরিসরের মধ্যে থেকে আইনানুগ পথেই যা কিছু করার করতে হবে।

জিজিয়া কর: প্রকৃত বাস্তব ও বহমান বাস্তবের সমীকরণ

জিজিয়া কর কথাটা শুনলেই আমাদের অনেকের মধ্যে খুব একটু মানসিক তাড়না অনুভূত হয়। কিছুতেই যেন সহজ ভাবে গ্রহণ করা যায় না বিষয়টিকে। আর এই না করতে পারাতে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। এখন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকতার যুগ। এই যুগে ধর্মভাবনার মানদণ্ডে বিচার করে কোনো একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ কোনো কর আরোপ করার ভাবনা সত্যিই অস্বস্তিকর। এই অস্বস্তির জায়গা থেকেই সম্রাট ঔরঙ্গজেব কর্তৃক জিজিয়া কর প্রবর্তনের বিষয়টিকে মেনে নিতে পারি না আমরা। অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাই তাঁকে, অনেকেই তাঁর মুণ্ডুপাত করি। কিন্তু যদি কোনোরকম বিদ্বেষ ভাবে আবিষ্ট না হয়ে, মুক্তবোধ সহযোগে গোটা বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা হয় তবে বদলে যেতে পারে অনেক ধারণা বা সিদ্ধান্ত।

জিজিয়া করের বিষয়টি ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। ইসলামি রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম নাগরিক বসবাস করে তাদের উপর প্রযোজ্য হয় জিজিয়া কর। অবশ্য এইটুকু বলা হলে জিজিয়া কর সম্পর্কে সবটা বলা হয় না। এই পর্যন্ত শুনে মনে হতেই পারে। বিষয়টি সত্যিই খুব নেতিবাচক। কিন্তু প্রকৃত বাস্তব মোটেই তা নয়। আসলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে আরও নানা বিষয়। এই সব বিষয়ের সাপেক্ষে সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখতে হবে জিজিয়া করকে।

ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন মুসলমান নাগরিকের উপর প্রযোজ্য হয় অনেকগুলি শর্ত। যাকাত, ওসর, ফিতরা প্রভৃতি তার মধ্যে অন্যতম। গচ্ছিত অর্থের উপর শতকরা আড়াই শতাংশ হারে যাকাত প্রদান করা মুসলমানের নাগরিকমাত্রের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কোনো ব্যক্তি যদি উপযুক্ত পরিমাণে যাকাত প্রদানে অসম্মত হন তবে রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে বল প্রয়োগ করে হলেও তার কাছে থেকে যাকাত আদায় করার। রাষ্ট্রের নির্দেশকে এক্ষেত্রে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

আনোয়ার সাদাত হালদার

সহকারী অধ্যাপক, সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

যাকাত এর মতোই একজন ইমানদারের জন্য অনুরূপ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য শাসকশ্রেণির নির্দেশ ক্রমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া; বিশেষ রকমের শারীরিক অসুস্থতা ও ওই জাতীয় গুরুতর কোনো অজুহাত ছাড়া কারোরই এক্তিয়ার নেই সম্মুখ সমর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার। তেমন হলে রাষ্ট্রশক্তি তার উপর কঠিন দণ্ডাদেশ কার্যকর করতে পারে।

ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন মুসলমান এই যেসব বিশেষ কর্তব্যের বাঁধনে আবদ্ধ তার কোনোটিই কার্যকর নয় কোনো অমুসলমান নাগরিকের জন্য। অমুসলমান নাগরিকের দিক থেকে যাকাত প্রদান করার কোনো আবশ্যকতা নেই। নেই রাষ্ট্রের পক্ষে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ারও। কেউ স্বইচ্ছায় তার দেশের প্রয়োজনে যুদ্ধযাত্রা করতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কোনো অধিকার নেই তাকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করার।

এদিকে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন মুসলমান নাগরিকের মতো একজন অমুসলমান নাগরিকেরও পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। ধর্মের বিভিন্নতার জন্য সংশ্লিষ্ট কোনো অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ নেই। এই অবস্থায়, অমুসলমান নাগরিকের সাপেক্ষে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বলবৎ করা হয় জিজিয়া করের বিষয়টি। রাষ্ট্র তার নাগরিককে নিরাপত্তা প্রদান সহ যাবতীয় নাগরিক সুবিধা প্রদান করবে। বিনিময়ে নাগরিকের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রকে দেওয়া হবে জিজিয়া কর। কাজেই এর মধ্যে নেতিবাচকতার কিছু নেই।

যদি এমন হত, অমুসলমান নাগরিকের উপর অপরাপর সব কর্তব্যও বজায় আছে; তার উপর অতিরিক্ত হিসেবে জিজিয়া কর আরোপ করা হয়েছে, তবে অবশ্যই তা দোষণীয় হত। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু মাত্র কোনো দোষ নেই। দোষ যে নেই তা আরও স্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হয় বিভিন্ন ঘটনা সূত্রে।

অমুসলমান নাগরিকদের থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হয় এই শর্তে, রাষ্ট্র উক্ত নাগরিকের জান ও মালের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করবে। যদি এমন হয়, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নাগরিকদের জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে অমুসলমান নাগরিকদের থেকে জিজিয়া আদায় করা হবে না; এমনটাই বিধান।

হজরত ওমরের শাসনকালের একটি বৃত্তান্ত এক্ষেত্রে স্মরণীয়। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা তখনও সেভাবে প্রসারিত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখনকার প্রবল পরাক্রমশালী রোমান সম্রাজ্যের সাপেক্ষে অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্র। যে কোনো সময়ে ধ্বসে যেতে পারে এর ভিত্তি।

এমন অস্থির অবস্থার মধ্যে হজরত ওমর একদিন শুনতে পান না, রোমান সৈন্যরা সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মুসলিমদের ধন সম্পত্তি হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের জানেরও নিরাপত্তা দেওয়া যাচ্ছে না সেভাবে। এই সংবাদ পাওয়ার পর, খলিফা আলাদা করে খবর নেন, ওই অঞ্চলের অমুসলিম নাগরিকদের সম্বন্ধে; জানতে চান তাদের থেকে জিজিয়া আদায় করা হয়েছে কি না। এতে তাঁকে জানানো হয়, যে জিজিয়া আদায় করা হয়েছে। এটা জানার পর তিনি নির্দেশ দেন, দ্রুত আদায়কৃত জিজিয়া ফেরত দেওয়ার জন্য। অতঃপর তা ফেরত দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্কটা সুস্পষ্ট। যেহেতু নাগরিকদের জান মালের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাই রাষ্ট্রের পক্ষে জিজিয়া কর গ্রহণ করার কোনো এক্তিয়ার নেই। জিজিয়া করকে ঘিরে যে ভুল ধারণা দানা বেঁধেছে তার নেপথ্যে আরও কিছু সঙ্গত কারণ রয়েছে। যে কোনো বিষয়েই কালক্রমে আদর্শগত অবস্থান ও বাস্তব অবস্থানের মধ্যে কমবেশি ব্যবধান তৈরি হয় এবং ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একটা সময় ছিল যখন ইসলামি রাষ্ট্রে ইসলামের বিধিবিধানই ছিল শেষকথা। কিন্তু ক্রমশ এই অবস্থার অবনতি হয়। নামে খিলাফত প্রযোজ্য থাকলেও কার্যত রাজতন্ত্রের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন মুসলমান শাসকরা। পরে সর্বাত্মক খিলাফতের অবসান হয়ে একাধিক ইসলামিক রাষ্ট্র তৈরি হলে অবস্থার আরও অবনতি হয়।

ইসলামি মূল্যবোধ থেকে সরে এসে কোনো কোনো রাজন্যবর্গ জিজিয়া কর আদায়ে তৎপরতা দেখান। প্রজার লাভালাভ বা তাদের স্বার্থের দিকটি নিশ্চিত না করেই জিজিয়া আদায়ের উপর জোর দেওয়া হয়; ক্ষেত্রবিশেষে বল প্রয়োগও করা হয়ে থাকতে পারে। অন্তত এমন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তবে তার অর্থ এই নয়, জিজিয়া কর আদায় করে তারা গুরুতর কিছু অন্যায় করেছিলেন। বিষয়টা কোর নিক ন্যায়ের পরিপন্থী ছিল না কোনো দিনই। এখন যে অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষ শাসনতন্ত্রের ধারণা প্রচলিত হয়েছে তখন তার অস্তিত্ব ছিলনা। রাজার ধর্মরাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় বরাবরই প্রাধান্য পেত। সেই সূত্রেই মুসলমান রাজারা তাদের অমুসলমান প্রজাদের থেকে জিজিয়া কর আদায় করতেন। অবশ্য জিজিয়া করের যৌক্তিকতা নিয়ে আরও প্রশ্ন উঠতে পারে। হজরত আলির মৃত্যুর পর যখন থেকে প্রকৃত খিলাফতের অবসান হচ্ছে তখন থেকে ইসলামি রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের তো বটেই মুসলমান নাগরিকদের জন্যও রাষ্ট্রের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করা ও প্রত্যক্ষ সমরে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক কোনো বিষয় ছিল না। ততদিনে বেতনভুক সেনাবাহিনীর ধারণা বলবৎ হয়েছে এবং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যে কেউ সেনাবাহিনীতে নাম লেখাচ্ছে। এই অবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের থেকে আলাদা করে জিজিয়া কর আদায় করার যৌক্তিকতা কোথায়!

আপাত ভাবে এই বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিবেচ্য বিষয়টা কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায় না। জিজিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে যেমন দেশের হয়ে যুদ্ধ করার দায় তেমনি যাকাত, ফেতরা, উসর প্রভৃতিও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ের কোনোটিই অমুসলিমদের সাপেক্ষে প্রযোজ্য ছিল না কোনোদিনই; সেদিনও না, আজও নয়। তাদের থেকে যাকাত, ফেতরা, উসর এসব কোনো কিছুই আদায় করা হত না। এমন অবস্থায় জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখার সাপেক্ষে জিজিয়ার আবশ্যকতা ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্য মুসলমানরা রাষ্ট্র নির্দেশিত বিভিন্ন আর্থিক দায়ভার বহন করবে আর অন্যেরা তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে; তেমন হলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেওয়া অনিবার্য। মুসলমান শাসকরা তাই সঙ্গতভাবেই জিজিয়া আদায় করতেন।

জিজিয়া নিয়ে যে নেতিসত্য আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার নেপথ্যে সম্রাট আকবরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম জিজিয়া কর তুলে নেন। তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ বাবর বা হুমাউন এর সময়ে তো বটেই, আরও আগে যে সুলতানরা রাজত্ব করতেন তারা প্রত্যেকে বরাবরই অমুসলমান প্রজাদের থেকে জিজিয়া আদায় করতেন। এ নিয়ে কোনোদিনও আলাদা করে কোনো সমস্যা হয়নি। সমস্যা যা একটু হয়েছিল তা ঔরঙ্গজেবের সময়। অনেক দিন বন্ধ থাকার পর নতুন করে জিজিয়া কর প্রবর্তন করা হলে হিন্দু সমাজের একটা অংশ কমবেশি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে মনে রাখতে হবে, এই অসন্তোষের বিষয়টিও কখনো মাত্রাতিরিক্ত ছিল না। মাত্রাতিরিক্ত যে ছিল না তারও বিশেষ প্রমাণ রয়েছে।

ঔরঙ্গজেব জিজিয়া কর প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন জাতি বা বর্ণ নির্বিশেষ। তাঁর এই নির্দেশনামার প্রেক্ষিতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সমাজের উচ্চবর্গ। নিম্নবর্গের সঙ্গে সমহারে কর দেওয়ার বিষয়টি তাদের জন্য অসম্মানজনক বলে মনে হয়েছিল। তাদের ইচ্ছা অনুসারে অতঃপর জিজিয়া করে বিভিন্নতা আনা হয়, যথা- ব্রাহ্মণ ৪০ টাকা, কায়স্থ ৩০, বৈশ্য ২০ টাকা ও শুদ্র ১০ টাকা। যদি জিজিয়া করের বিরোধিতাই শেষকথা হত এমনটা হত না কিছুতেই।

জিজিয়া নিয়ে যে নেতিসত্য আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার নেপথ্যে সম্রাট আকবরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম জিজিয়া কর তুলে নেন। তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ বাবর বা হুমাউন এর সময়ে তো বটেই, আরও আগে যে সুলতানরা রাজত্ব করতেন তারা প্রত্যেকে বরাবরই অমুসলমান প্রজাদের থেকে জিজিয়া আদায় করতেন। এ নিয়ে কোনোদিনও আলাদা করে কোনো সমস্যা হয়নি। সমস্যা যা একটু হয়েছিল তা ঔরঙ্গজেবের সময়। অনেক দিন বন্ধ থাকার পর নতুন করে জিজিয়া কর প্রবর্তন করা হলে হিন্দু সমাজের একটা অংশ কমবেশি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে মনে রাখতে হবে, এই অসন্তোষের বিষয়টিও কখনো মাত্রাতিরিক্ত ছিল না।

ইতিহাস

ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর রূপজালাল

ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর কথা আমরা কেউ কেউ কমবেশি জানি; নামে শোনা আছে তাঁর রূপজালাল-এরও। কিন্তু গ্রন্থটির সঙ্গে ঘনিষ্ট জানা চেনা রয়েছে খুব কম জনেরই। বিশেষত এই বঙ্গের বুধমণ্ডলীর। এই না থাকাটা অবশ্যই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এই সেদিন পর্যন্ত রূপজালাল আক্ষরিক অর্থেই আমাদের ধরা ছোঁয়ার প্রায় বাইরের বিষয় ছিল। অনেক দিন আগে

আজিজুল হক

গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস এর সম্পাদনা সহযোগে প্রকাশিত হয়েছিল বইটি। সে প্রকাশ সংবাদ এপারে সেভাবে ঢেউ তোলেনি; তাছাড়া ওপারের বই এপারে বসে হাতে পাওয়া প্রায়শই বিশেষ সুবিধাজনক হয় না।

অতি সম্প্রতি অবশ্য রূপজালাল-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আত্মীয়ত, করার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। বুকস স্পেস, কলকাতা থেকে সাইফুল্লা ও কামরুল হাসান এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'প্রাক সাতচল্লিশ পর্বে বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা' শীর্ষক চার খণ্ডে বিন্যস্ত। যে রচনা তার চতুর্থ খণ্ড 'নাটক ও অন্যান্য' তে সংকলিত হয়েছে রূপজালাল। আলাদা করে গ্রন্থাকারে এটি এখনও কলকাতায় অপ্রাপ্য।

সেদিক থেকে দেখলে এ হল দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো (তবু আপাতত তাই শিরোধার্য। কথায় বলে, নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো।

যে যাই হোক, এখন আসা যাক রূপজালাল এর কথায়। রূপজালাল আত্মীজবনীমূলক রচনা। তবে প্রচলিত আত্মজীবনী মূলক রচনার ঢঙে বা রীতিতে এ গ্রন্থ পরিকল্পিত ও রূপায়িত নয়। এর ধরন অনেকটাই অন্য রকমের। খোলা চোখে দেখলে, একে রূপকথাধর্মী রচনা বলে মনে হয়। গ্রন্থের সিংহভাগ অংশ জুড়ে বর্ণিত হয়েছে রাজকুমার জালাল ও রাজকুমারী রূপবানুর এর ইতিবৃত্ত। যা সম্পূর্ণত রূপকথা ধর্মী। গ্রন্থকারের কথা সেখানে সেভাবে নেই বললেই চলে। তবু রূপজালালকে রূপকথা-র শ্রেণিতে রাখা যাবে না। একে আত্মজীবনীমূলক রচনাই বলতে হবে। কেননা তার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

রূপজালাল-এর রূপকার ফয়জুন্নেসা গ্রন্থটি প্রণয়ন করতে প্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর নিজের কথা বলার জন্য। কিন্তু যুগপরিবেশ তেমন অনুকূল ছিল না। একজম মহিলা আত্মজীবনী লিখবেন। তা সে তিনি যতই জমিদারপত্নী বা নিজেও জমিদার হন না কেন! এতটা প্রগতিশীলতাকে ধারণ ও লালন করার জন্য আমাদের সমাজ তখনও দেহমনে সেভাবে সেজে ওঠেনি। ফয়জুন্নেসা তাই সচেতনভাবেই রূপকথার আবরণে আবৃত করার চেষ্টা করেছেন নিজেকে। রূপজালাল-এ রূপকথার আবরণ রয়েছে। তবে উৎসাহী পাঠকের পক্ষে সে আবরণ সরিয়ে গ্রন্থকারের ব্যক্তি জীবনের পাঠ নেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। এখানে লেখিকা তাঁর দিক থেকে এমন কিছু উপকারণ সাজিয়ে রেখেছেন যা অবলম্বন করে শেষাবধি লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

গ্রন্থের সূচনায় সংযোজিত হয়েছে 'অথ গ্রন্থকারিণীর স্বীয় বংশের বিবরণ ও পুস্তক লিখিবার উদ্দেশ্য' শিরোনামের একটি পরিচ্ছেদ। এখানে লেখিকা তার বংশগত পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি নিজের কথাও বেশ করে বলেছেন। তার এই কথনসূত্রে যে বৃত্তান্ত প্রতীয়মান হয়েছে তা এইরকম-

লেখিকা ছিলেন প্রখ্যাত জমিদার পরিবারে দুই পুত্রের পর জন্ম নেওয়া একমাত্র কন্যা। অর্থাৎ ধনীর দুলালী বলতে যা বোঝায় তাই। প্রত্যাশা মতোই সতত আনন্দ স্নাত অবস্থায় অতিবাহিত হচ্ছিল তাঁর সময়। কিন্তু সহসা মারাত্মক ছন্দপতন ঘটে এতে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হন তাঁর বাবা। অতঃপর দ্রুত সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ভাইয়েরা তখনও বেশ ছোট। লেখিকা তো আরও ছোটো। তিন সন্তানকে নিয়ে আতান্তরে পড়েন তাঁর মা। এই অবস্থায় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পেরে গুরুতর একটা ভুল করে বসেন তিনি। ফলজুন্নেসা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। তাঁর রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে জনৈক নিকট আত্মীয় তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল প্রায় হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই রাজী হননি ফয়জুন্নেসার পিতা। হতাশ মনোরথ হয়ে ওই আত্মীয় ততদিনে অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করেছেন। অন্য নারীর পাণি গ্রহণ করলেও ফয়জুন্নেসার প্রতি আগ্রহ তখনও তার কিছুমাত্র কমেনি এখন অবস্থার সুযোগ নিয়ে নতুন করে উদ্যোগী হল সে এবং ফয়জুন্নেসার মা তার এখনকার এই ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলেন। ফলত সতীনের সংসারে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে প্রবেশ করতে হল ফয়জুন্নেসা-কে এরপর যা হয় তাই হল। একসময় তিষ্ঠাতে না পেরে এজন্মে আর স্বামীর-মুখ দর্শন না করার কঠিন শপথ নিয়ে শ্বশুরালয় ছেড়ে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ফয়জুন্নেসা; মাগার তুলে নেন পৈতৃক জমিদারি সামলানোর দায়ভার। জমিদারির কার্যভার তিনি দক্ষতার সাথে সামলান বটে, কিন্তু লাঞ্ছিত নারীত্বের যন্ত্রণা-ভার থেকে মুক্ত হতে পান না কিছুতেই। তাই অবসর সময়ে ডুব দিতে চান বিদ্যাচর্চার গভীরে। এই পথে জড়াতে চান মনের জ্বালা। কিন্তু তাতেও যে কিছুতেই নেভে না সে জ্বালা। তাই শেষাবধি দুঃসহ এই যন্ত্রণাকে স্থায়ী রাপ দেওয়ার জন্য রূপজালাল রচনায় মনোনিবেশ করেন।

রূপজালাল বেশ অদ্ভুত ধরনের। লাঞ্ছিত নারীত্বের যন্ত্রণা উপশমের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে গ্রন্থের; গ্রন্থটিকে উৎসর্গ করা হয়েছে এক্ষেত্রে লাঞ্ছিত নারীত্বের মূল কারবারি যে সেই মহাম্মদ গাজীকে কেবল উৎসর্গ করা হয়নি; পরম শ্রদ্ধাভরে নিবেদন করা হয়েছে তা 'শ্রীশ্রীযুক্ত মাহাম্মদ গাজী। চতুধুরিণঃ।।' তবে বিষয়টা এমনিতে অদ্ভুত বলে মনে হলেও স্বরূপত তা নয় ফয়জুন্নেসা ছিলেন আসলে মনে প্রাণে চিরন্তন বাঙালি মেয়েদের একজন। স্বামী-পুত্র-কন্যা সহযোগে পরিপূর্ণ সংসাদ-জীবন সমুদ্রে সন্তরণ করা ছিল তাঁর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। আর এই আকাঙ্ক্ষার মূল উপজীব্য যে গভীর পতি-প্রেম তা থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। পারেননি কিছুতেই। তাই অনেক অনুযোগ, অভিযোগ ও ক্ষোভের জলধি পাড়ি দিয়ে রূপজালাল-কে স্বামীর পদতলে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

আমাদের জাতীয় জীবন জুড়ে বহমান যে মূল্যবোধ তার উজ্জ্বল উদ্ভাসন ফয়জুন্নেসা ও তাঁর রূপজালাল।

সে যা হোক, এখন অন্য কথা। গ্রন্থটি বিষয় ও জীবন ভাবনার দিক থেকে যেমন বিশিষ্ট তেমনি রচনারীতিতেও রয়েছে বিশেষ কিছু বিশিষ্টতা। আত্মজীবনের সঙ্গে রূপকথার মিশেল তো বয়েছেই, পশ.প.শি আরও রয়েছে গদ্য ও পদ্যরীতির সংমিশ্রণ। গ্রন্থের দুই তৃতীয়াংশের মূল অবলম্বন পদ্য ভাষা। পদ্য এখানে আধুনিক সুলভ নয় একেবারেই; পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ নির্ভর; সম্পূর্ণত সনাতন রীতির। গদ্য ভাষায় বরং বেশ অভিনবত্ব বা নিজস্বতা বর্তমান। ১৮৭৬ সালে রূপজালাল যখন প্রণীত হচ্ছে ততদিনে বাংলা গদ্যভাষার বলিষ্ঠ ভিত্তি দাঁড়িয়ে গেছে। প্রকাশিত হয়েছে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে শুরু করে বিষবৃক্ষ (১৮৭২)-র মতো উপন্যাস: বাংলা গদ্য যেখানে বিশেষ মান্যতা পেয়েছে। কিন্তু এসব কিছুর দ্বারা সেভাবে প্রভাবিত হননি ফয়জুন্নেসা। তিনি নিজের মতো করে নিজেকে রচনা করতে উৎসাহী হয়েছেন। গদ্যভাষার সাপেক্ষেও ভাস্বর হতে চেয়েছেন স্বকীয়তায়।

"তখন যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনী। তুমি শীঘ্র অসিবে বলিয়া এত বিলম্ব করিলে কেন? আমি তোমার বিলম্ব দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ছিলাম। তদ্বরণে দানব তনয়া উত্তর করিলেন, আমার পরমায়ুর বল ছিল বিধায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিরাপদে প্রত্যাগত হইয়াছি।"-সমকালে প্রচলিত গদ্যভাষার সঙ্গে এই গদ্যকে ঠিক মেলানো চলে না। আধুনিকতা ও সনাতনত্বের বিশেষ সমন্বয় ঘটেছে এখানে। এই সমন্বয় কেবল গদ্য ভাষার নিরিখে নয়। সম্পূর্ণ রূপজালাল-এর সাপেক্ষেও সাধারণ সত্য। আর এই সত্যের মূল যে ফয়জুন্নেসার জীবনবোধের গভীরে প্রোথিত ছিল তা আমরা আগেই বলেছি।

ফয়জুন্নেসা যখন রূপজালাল রচনা করছেন বাঙালি মুসলমান সমাজে তখনও আধুনিক সাহিত্য ভাবনা ডাল পালা মেলতে পারেনি সেভাবে। পুথিসাহিত্যেরই রমরমা বাজার তখন। রূপজালাল পুথিসাহিত্য নয়। বিশেষত এ গ্রন্থে ব্যবহৃত গদ্যভাষার সঙ্গে পুথিসাহিত্যের ভাষার রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। সেদিক থেকে দেখলে বাঙালি মুসলমান সমাজে আধুনিক গদ্যভাষার নান্দীপাঠ করেছিলেন ফয়জুন্নেসা। গদ্যশিল্পী মশাররফ এর অসামান্য উদ্ভাসনের পঠভূমিকে প্রশস্ত করেছিলেন তিনি।

সব শেষে তারও একটি কথা। খুব সম্ভব ফয়জুন্নেসার রূপজালাল বাঙালি মেয়েদের লেখা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। রূপজালাল প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ এ। স্বর্ণময়ী দেবীর 'দীপনির্বাণ'-ও প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ এ। তবে ফেব্রুয়ারি বা তার আগে কিনা তা নিশ্চিত নয়। যতক্ষণ তা নিশ্চিত না হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ রূপজালাল-কেই প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসেবে বিবেচনা করা শ্রেয়। এমন একটি রচনার সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমী যে কারও প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

রূপজালাল-এর রূপকার ফয়জুন্নেসা গ্রন্থটি প্রণয়ন করতে প্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর নিজের কথা বলার জন্য। কিন্তু যুগপরিবেশ তেমন অনুকূল ছিল না। একজম মহিলা আত্মজীবনী লিখবেন। তা সে তিনি যতই জমিদারপত্নী বা নিজেও জমিদার হন না কেন! এতটা প্রগতিশীলতাকে ধারণ ও লালন করার জন্য আমাদের সমাজ তখনও দেহমনে সেভাবে সেজে ওঠেনি। ফয়জুন্নেসা তাই সচেতনভাবেই রূপকথার আবরণে আবৃত করার চেষ্টা করেছেন নিজেকে। রূপজালাল-এ রূপকথার আবরণ রয়েছে। তবে উৎসাহী পাঠকের পক্ষে সে আবরণ সরিয়ে গ্রন্থকারের ব্যক্তি জীবনের পাঠ নেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

বই পড়া

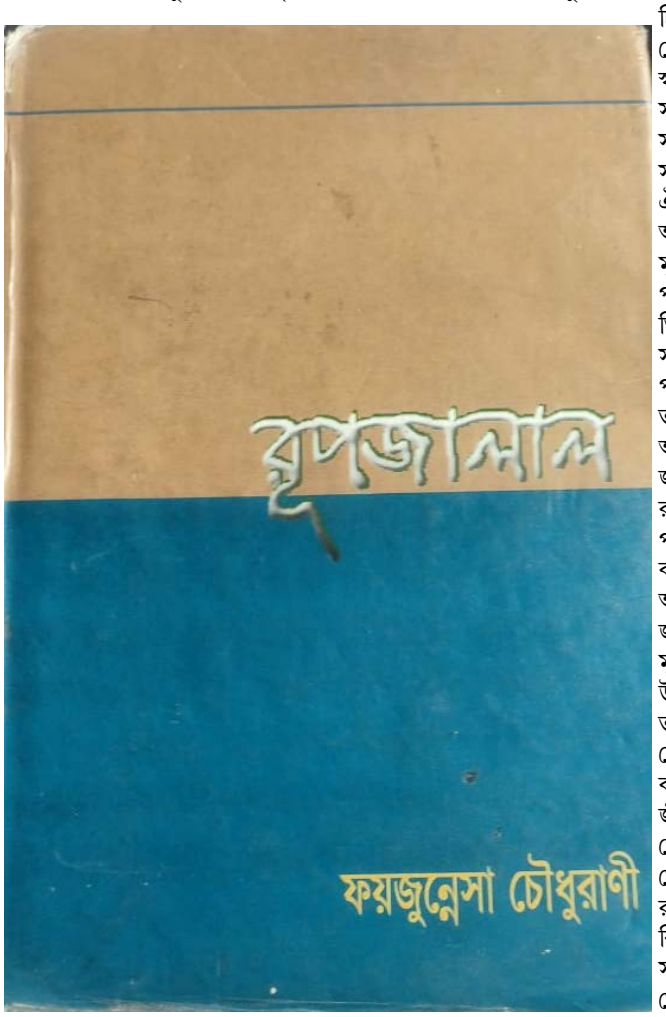

দৃষ্টি (প্রস্তাবিত) ট্রাস্টের পক্ষে মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৮৯০২৪০৮৪২০, ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩২৮৮০২৪২ সম্পাদক: সাইফুল্লা।
On behalf of Drishti Trust, Published by Mir Rejaul Karim, Published from 38 Dr. Suresh Sarkar Road(West Block, 2nd Floor), Kolkata-700014, M: 94328800242, 86370864691, 8902408420
Email: samim.saifulla@gmail.com, rafakarimnbu@gmail.com **Editor: SAIFULLA**